ভেতরে

গৈরিক বাহিনীর হাতে শিক্ষার অধঃপতনের ২
গণমঞ্চ-র কনভেনশনের প্রচার পত্র ... ৩
কৃষক কনভেনশন, নাগরিক কনভেনশন ... ৪
... নবারুণ যেন ফণিমনসার বেয়াড়া ঝাড় ... ৫
সরোজ দত্ত স্মরণে আলোচনা সভা ... ৬
আমাদের শিশুরা সব কোথায় গেল! ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ২৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৭ আগস্ট ২০১৪

শহীদ সরোজ দত্ত স্মরণ ঃ ওরা যাঁকে ভয় পেয়েছিল

৫ আগস্টে কার্জন পার্কে সরোজ দত্তের আবক্ষ মূর্তির সামনে স্মরণসভা চলাকালীন আকাশে শ্রাবণের মেঘ বৃষ্টির বেদনাকে বুকে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। স্মরণ কর্মসূচীর আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ। তার সাথে শরিক হয় সরোজ দত্ত জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি। মাল্যদান করে বিপ্লবী নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নিমাই ঘোষ, কুণাল দত্ত, সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল, রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, ‘‘আজকের দেশব্রতী’’র পক্ষে অরূপ পাল সহ সি পি আই (এম এল), এ আই সি সি টি ইউ, সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পক্ষ থেকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দন সেন। স্মরণ কর্মসূচী সঞ্চালনা করেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত।

অনুষ্ঠান শুরু হয় দুই তরুণ ছাত্র আকাশ-প্রতীকের যুদ্ধবিরোধী গান দিয়ে।

‘‘সরোজ দত্তের লৌহ কলম সংশোধনবাদকে ছিন্নভিন্ন করেছিল’’ বললেন সভার প্রথম বক্তা ’৬০-এর দশকে সরোজ দত্তের ছায়াসঙ্গী বর্ষীয়ান বিপ্লবী কমিউনিস্ট নিমাই ঘোষ। তাঁর মতে সরোজ দত্তের মৃত্যু ঘিরে শাসকশ্রেণী যে রহস্যের লৌহবেষ্টনী গড়ে তুলেছে তা সরিয়ে ফেলার দায়িত্ব নিতে হবে এই প্রজন্মের যুব সমাজকে।

‘‘শাসকের প্রচারে সরোজ দত্ত ‘নিখোঁজ’। কোনও পুলিশ ফাইলে সরোজ দত্তকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সরোজ দত্তকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। দেশব্রতী সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে সরোজ দত্ত বেঁচে আছেন থাকবেন।’’ এ বক্তব্য শহীদ সরোজ দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য কুনাল দত্তের। তিনি আরও বলেন, সমাজের অবহেলিত প্রান্তিক মানুষগুলোর প্রতি সরোজ দত্তের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা। গোলাম কুদ্দুসের কথা অনুযায়ী সরোজ দত্ত ছিলেন ‘‘পলিটিক্যাল সেন্ট’’। তাঁর সহজ সরল জীবনযাত্রা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি ও আত্মত্যাগ কমিউনিস্ট নেতাদের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ। সরোজ দত্তের প্রতি বর্বর আচরণ-নারকীয় উন্মত্ততার কারণ কী তা ব্যাখ্যা করেন পার্থ ঘোষ। তিনি বলেন, শাসকশ্রেণীর হৃদপিণ্ডে রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীর তথাকথিত নবজাগরণকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন সরোজ দত্ত। ’৭০ দশকে কাশীপুর, বরানগর, বারাসাত, কোন্নগরে গণহত্যা ও জেলে জেলে বন্দী হত্যার মধ্যে দিয়ে একটা গোটা প্রজন্মকে নিকেশ করে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল শাসকবর্গ। তার বিচার হয় না। বর্তমানে রাজ্যে সবুজ ও কেন্দ্রে গৈরিক বাহিনীর যৌথ যুগলবন্দীতে চলছে প্রতারণা

ছয়ের পাতায় দেখুন

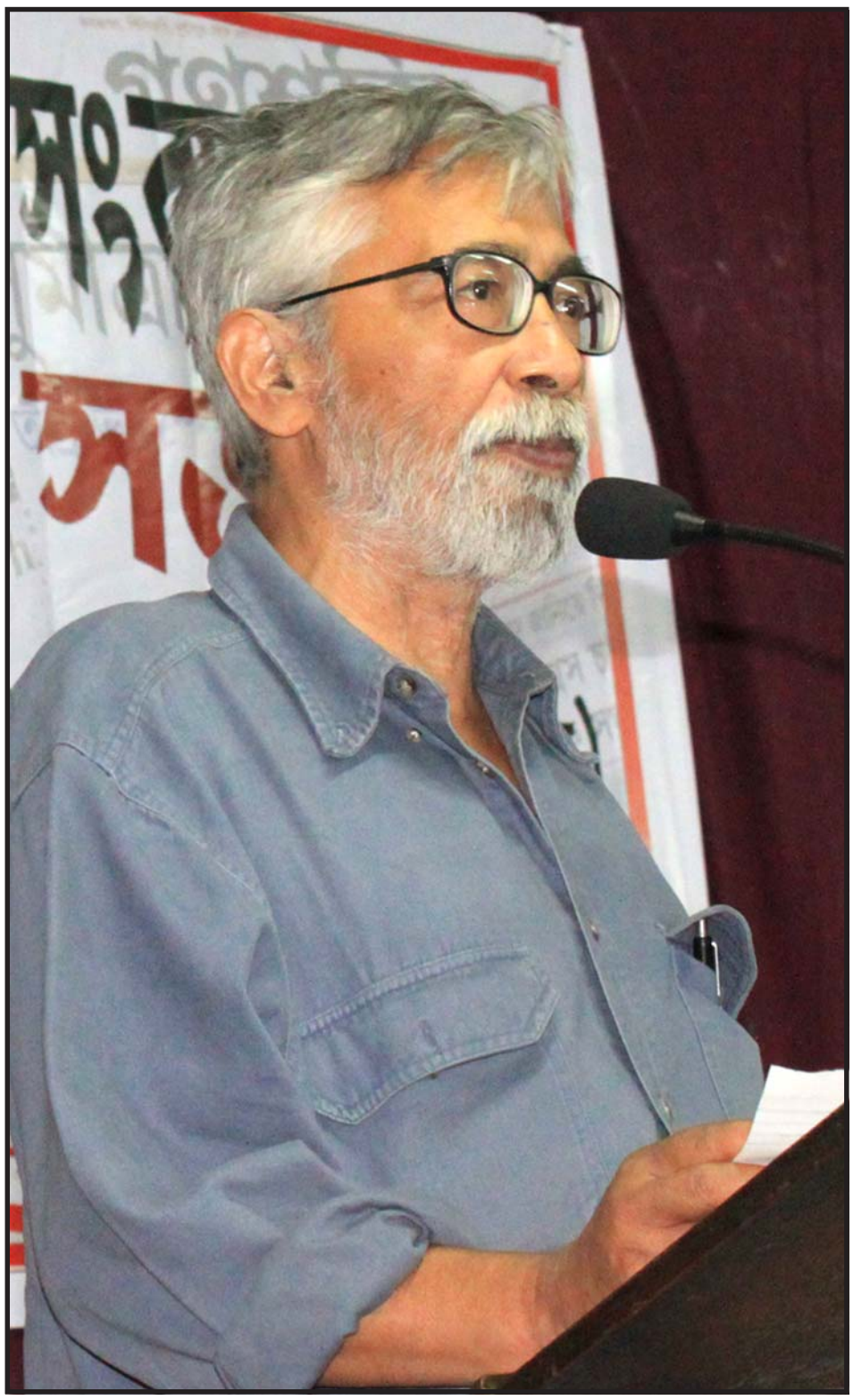

সাহিত্যের সার্কাসের আউটসাইডার নবারুণ ভট্টাচার্য

‘‘সাহিত্যের সার্কাসের আউটসাইডার’’ নবারুণ ভট্টাচার্য মৃত্যু উপত্যকা ছেড়ে চলে গেলেন এমন এক সময়ে যখন এদেশে তো বটেই সারা পৃথিবীটাই মৃত্যু উপত্যকা হয়ে উঠেছে; গাজা কিংবা ইউক্রেন বা নাইজেরিয়া অথবা লিবিয়া ক্রমাগতই বিস্তৃত হচ্ছে সেই পরিধি। নবারুণদা বলেছিলেন, ‘‘ভালো ফুটবল খেলতে পারলে এ লাইনে তিনি আসতেন না’’। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি ভাল ফুটবল খেলতে পারেননি। যদি তিনি না আসতেন সাহিত্যের লাইনে তাহলে কে লিখত সেই নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষদের কথা, যাদের মধ্যে তিনি বড় হয়েছেন, সেই ফ্যাতাড়ুদের অসামান্য কাণ্ডকারখানা তো আমাদের অগোচরেই থেকে যেত। ডি এস, মার্শাল ভদি, পুরন্দর ভাট, বড়িলালদের মতো চরিত্র তো বাংলা সাহিত্যের অজানা থেকে যেত। অনেকে বলেন নবারুণদা মানেই ফ্যাতাড়ু, এমনটা নয়। তাতো নয়ই। নবারুণদা একটা গোটা মানুষ। তিনি রাত জেগে ফুটবল খেলা দেখেন। ছবি নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধুজনের সঙ্গে, ফিল্মের অসামান্য দর্শক এবং বোদ্ধা, একজন আদ্যন্ত নাটকের লোক, অর্থনীতির ভাবনায়ও তাঁর সমাজসম্পৃক্ত অনুসন্ধান, রাজনীতি তিনি পরোক্ষে নয় প্রত্যক্ষেই করেছেন, তার সাক্ষী ২০০৭-১১-এর পশ্চিমবঙ্গের দ্রোহকাল। সেই যে ‘‘মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না’’ লেখার মধ্য দিয়ে ঘোষণা, রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানের বিপ্রতীপেই তাঁর অবস্থান; সেখান থেকে তিনি কখনও সরেননি। তিনি বামপন্থী কিন্তু সি পি এমের ধারে কাছে ঘেঁসেননি। তিনি সি পি এম বিরাধী কিন্তু কখনও তৃণমূলকে সমর্থন করেননি। তিনি কখনও মনে করেননি কেবল কিছু জঙ্গলে দখল কায়েম করার চেষ্টা করে ভারত নামক বিশাল রাষ্ট্রযন্ত্রকে উৎখাত করা যাবে।

নবারুণদা মার্কসবাদে বিশ্বাস করতেন কিন্তু একদম অনুগত মার্কসিস্ট ছিলেন না। এই বিশ্ব মানুষই সবচেয়ে প্রধান এই ধারণার সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারেননি। তাঁর কাছে পশু পাখি গাছ পালা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শহুরে সমাজের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধিকৃত (এমনকি মার্কসবাদিদের দ্বারাও) ‘লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত’-এর অ্যালকেমি নিয়ে যেমন, তিনি ভাবতেন রাস্তার কুকুর, কাক, চড়ুই, শালিক, শামুকদের নিয়েও। তিনি ছাড়া আর কেইবা বলেছেন, ‘‘... রাস্তার কুকুরদের বরাদ্দ রোদ কেড়ে নেবে হাইরাইজ আর নিরাপদ সাহিত্যের দ্যামনামি করব বা ক্ষমতাসীন অক্ষমদের চিয়ারলিডার হয়ে মজা মারব এটা হয় না।’’। কিন্তু সমাজবাদের কোন বিকল্প নেই এই প্রতীতিতে তাঁর আস্থা ছিল অটুট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের ভূমিকার প্রতি তাঁর যেমন শ্রদ্ধা ছিল, তেমনি

ছয়ের পাতায় দেখুন

এই মৃত্যু উপত্যকা ছেড়ে গেলেন রুষ্ঠ কবি-সাহিত্যিক নবারুণ ভট্টাচার্য। ৩১ জুলাই ২০১৪, ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে ‘পিস হাভেন’, পরদিন সেখান থেকে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন অফিস, তারপর সংস্কৃত কলেজ হয়ে তাঁর বাসস্থান গল্ফগ্রীনের ঠিকানায়। অন্তিম শ্রদ্ধায় শেষ বিদায়। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে বিলীন হয়ে গেলেন তিনি। (ফাইল চিত্র থেকে ফটো)—মমতা সরকারের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে ‘‘আজকের দেশব্রতী’’ আয়োজিত প্রতিবাদী কনভেনশনে মুখ্য বক্তা নবারুণ ভট্টাচার্য।

সম্পাদকীয়

নতুন বোতলে পুরোনো মদ

পশ্চিমবঙ্গ সি পি এম নেতৃত্ব বলছে দলের ভাবমূর্তি আবার ফিরে আসবে। একটু ধৈর্য রাখতে হবে, একটু সময় দিতে হবে, যতটা সময় লাগে আস্থা অর্জনে প্রয়াসী হবে। মানুষ যেভাবে চায় মানুষের সাহায্য নিয়ে সেভাবেই মানুষের পছন্দের পার্টি হয়ে উঠতে হবে। লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে দেওয়া হবে না। শিথিলতা কাটাতে হবে। কাজের স্টাইল পবিরর্তন করতে হবে। সংগঠনকে মতাদর্শে মজবুত করে সাজাতে হবে। রাস্তায় নেমে গণআন্দোলন করতে হবে। বামফ্রন্টের বাইরের বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোর সাথে ঐক্য গড়ে তোলা হবে।

প্রতিশ্রুতি ও প্রস্তুতির এই প্যাকেজ বার্তা দিল সি পি এম। দলের প্রয়াত কাকাবাবুর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে। হাল ধরার ভূমিকায় নেতৃত্বের ত্রয়ী—প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য সম্পাদক ও বিধানসভায় বিরোধী দল নেতা। তবে কি সি পি এম ধাতে পাল্টাচ্ছে! পাল্টি খাওয়া ইতিহাস তো কম লম্বা নয়! ওপরের বক্তব্যে অবশ্য কদিন আগেকার অবস্থানের চেয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

২০১১-র নির্বাচনে রাজ্যের শাসনক্ষমতা থেকে উৎপাটিত হতে হয়েছে। বিরোধী কোন সমীকরণের মারপ্যাঁচে নয়। পরিষ্কার, বিদ্রোহের গণরায়ে। তার পরেও কিন্তু ভুলেও ভুলের মাশুল গোনার কথা স্বীকার করা হয়নি। কারণটা দেখানো হয়েছিল তৃণমূলের অনুকূলে জনগণের রায়ে ভ্রান্তি ঘটেছে। ভুল স্বীকারে শুধু অনীহা নয়, অস্বীকারে মরীয়া হয়েছিল দলনেতৃত্ব। বরং বাসনা পোষণ করা হচ্ছিল—চুপচাপ থাকা যাক, নয়া শাসকদের হিমশিম খাওয়ার অপেক্ষায় থাকা শ্রেয়, তার প্রতিক্রিয়ায় আবার দলের ফিরে আসার কপাল-সরণী খুলে যাবে। তারপরে ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচন। দলের সামাজিক ভিত্তিতে আরও ধস নামল, সাধের পঞ্চায়েতরাজ চলে গেল। সামাজিক ভিত্তির বড় আকারে তৃণমূলমুখী ঢল নামল। নেতৃত্ব দিশেহারা হল, তবু আত্মানুসন্ধানের মোড় নিল না। বহু সময়ের অপচয় হল দলের কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে তথাকথিত আন্তদলীয় বিতর্কে। যেখানে সুবিধাবাদী অবস্থান থেকে একপক্ষ দেখাতে চেয়েছে যত গণ্ডগোল কেবল পশ্চিমবঙ্গে অনুসৃত পলিসিতে, কিন্তু কি সেই বিপর্যয় ডেকে আনার পলিসি তা নিয়ে মুখ খোলাখুলি হল না; অন্যপক্ষ যত দোষ দেখেছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার থেকে বেরিয়ে আসার কলাকৌশলের মধ্যে। এই চর্বিত-চর্বণের মধ্যে বামপন্থী শিক্ষার কোন সার খুঁজে পাওয়ার ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না। লোকসভা নির্বাচন ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে ঐ আন্ত আকচাআকচি অঘোষিতভাবে থামিয়ে দেওয়া হল। আবার দেখানো শুরু হয়ে গেল পাক্কা প্রয়োজনবাদী ছক কষা নকশা—কংগ্রেস-টি এম সি-বিজেপি-র ত্রিমুখী সংঘাতে মাঝখান থেকে সি পি এমের ভাগ্য পুনরুদ্ধার হতে পারে। কিন্তু পরিণামে অগত্যা কি হল! নির্বাচনী গণরায়ে দলের পোষা স্বপ্ন ভেঙ্গে আরও খানখান হয়েছে, সামাজিক ভিত্তির ধস তৃণমূলমুখী হওয়ার প্রবণতার জায়গায় পরিবর্তন যা এল তা হল বিজেপিমুখী হওয়ার। অবশ্যই তৃণমূলের সন্ত্রাসের মুখে নিরাপত্তার আর কোন আশাভরসা না দেখে। কেবল সরকার দেখানো, সরকারকে চোখের মণির মতন রক্ষা করা, সরকার থাকাই তো সংগ্রামী অস্তিত্ব থাকা ইত্যাদির ওপর বাম চেতনার সৌধ নির্মাণের দাবি করা হয়েছিল। অবিরত অধঃপতনের ধাক্কায় শেষমেশ রাজত্বও গেল, সামাজিক ভিত্তিতে নামল পরের পর বড় বড় ধস; লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল প্রবঞ্চনায় সাজানো 'বামবাগান'। ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! ডেপুটেশন দিতে গিয়ে কি লজ্জায় না পড়তে হল! বিজেপি যাতে সি পি এমকে ধসিয়ে বাড়তে না পারে সেই সতর্কতার বাণী শুনতে হল তৃণমূল মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে! সাম্প্রদায়িকতাকে মোকাবিলার প্রশ্নে যে সি পি এম কংগ্রেসকে একদা পরামর্শ দিত, আজ সি পি এমকে সেই পরামর্শ দিচ্ছে টি এম সি। সুবিধাবাদের এই ভঙ্গুর ও বিদ্রূপের পাত্র বনে যাওয়া চেহারা দেখে দল আরও ভাঙ্গছে। এই দুঃসময়ে নেতৃত্ব আবার আত্মশুদ্ধির প্যাকেজ রাখছেন।

কিন্তু ঘরপোড়া বাম মনের মানুষজন, আবার ইতিবাচক কৌতূহলী হলেও প্রশ্নাতীত মীমাংসা শুরু হওয়ার নয়। প্রশ্নগুলো একইরকম রয়ে গেছে, প্রশ্নগুলো তাড়া করছে। প্রশ্নগুলো যা যা নিয়ে যে যে মাত্রায় থেকে গেছে, আর সি পি এম নেতৃত্ব যেভাবে দলকে পরিবর্তনের পন্থা বাত্‌লাচ্ছেন তার মধ্যে কোন পারম্পর্য নেই। যে পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে তা বুনিয়াদী গণ্ডগোলকে স্পর্শ না করে। আর সেটা হল, সি পি এমের উত্থান ও পতনের একই যোগসূত্র—ক্ষমতা সর্বস্বতার চূড়ান্ত সুবিধাবাদী, প্রয়োজনীয়বাদী অধঃপতিত 'বামপন্থা'। এর বিরুদ্ধে মতাদর্শগত-রাজনৈতিক যুদ্ধ শুরু করা ছাড়া পরিবর্তনের প্রকৃত বামপন্থী যাত্রাপথ সি পি এমের ভেতর থেকে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। কেবল ভোটের কথা ভেবে দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলার প্যাকেজ নতুন বোতলে পুরোনো মদের মতই।

বল সি পি এমের কোর্টে।

সারা ভারত কিষাণ মহাসভার ডাকে

৯ আগস্ট

দেশজুড়ে জেলায় জেলায়

বিক্ষোভ

- কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে জমি অধিগ্রহণ বন্ধ কর।
- অধিগ্রহণের জমির ক্ষতিপূরণের মাত্রা কমানো বন্ধ কর।
- জি এম বীজ ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা কর।

গৈরিক বাহিনীর হাতে শিক্ষার অধঃপতনের ধারা আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে

মোদী সরকার অল্পকালই ক্ষমতায় রয়েছে—কিন্তু ইতিমধ্যেই গেরুয়া বাহিনীর দ্বারা স্কুল শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গবেষণার মানকে অধঃপতিত করে তোলার বিপর্যয়কর লক্ষণগুলো দেখা দিতে শুরু করেছে।

ইতিহাস গবেষণার ভারতীয় পর্ষদ-এর প্রধান রূপে ওয়াই সুদর্শন রাও-এর নিয়োগের মধ্যে দিয়ে প্রথম ইঙ্গিতটি মিলেছে যার থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে গেরুয়া মতাদর্শকেই শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান হওয়ার মানদণ্ড করে তুলেছে।

কোন খ্যাতনামা পত্রিকায় রাও-এর লেখাপত্র বেরোয়নি এবং তাঁর যা কিছু লেখাপত্র সবই রয়েছে ব্লগে দেওয়া লেখার রূপে। ঐ ধরনের পত্রিকায় লেখা না বেরোনোর ফলে রাও-এর লেখাগুলো মতাদর্শে রঞ্জিত অভিমত ছাড়া অন্য কিছু নয়, আর ঐ অভিমতগুলো যথেষ্ট উদ্বেগজনক হয়েই দেখা দেয়। রাও তাঁর প্রবন্ধগুলোতে ঘোষণা করেছেন যে, প্রাচীনকালে জাতপ্রথা ভালোভাবেই কাজ করছিল এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে অতীত ইতিহাসের এই ব্যবস্থাকে বিচার করা ঠিক নয়।

বৈষম্যকে মূর্ত করে তোলে যে ব্রাহ্মণ্যবাদী স্তরবিন্যাস তার পক্ষে দাঁড়ানোটা সংঘ পরিবারের মতাদর্শে কোন নতুন ব্যাপার নয়। সংঘ প্রতিষ্ঠাতা গোলওয়ালকার জাতপ্রথাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করে তার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছিলেন ঃ ''কোন উন্নত সমাজ যদি উপলব্ধি করে যে বিদ্যমান তারতম্যগুলো বৈজ্ঞানিক সামাজিক কাঠামোর জন্য রয়েছে এবং সেগুলো যদি সমাজ রূপ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রূপে দেখা দেয়, তবে ঐ বৈচিত্র্যকে বিচ্যুতি বলে বিবেচনা করা ঠিক নয়।'' (*অর্গানাইজার*, ১ ডিসেম্বর ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৭)। আর এস এস-এর আর এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দীনদয়াল উপাধ্যায়ও একই ধরনের যুক্তির অবতারণা করেছেন ঃ ''চারটি জাত (বর্ণ) সম্পর্কে আমাদের ধারণায় সেগুলোকে বিরাট পুরুষের (আদি মানব) চারটি অঙ্গ বলে মনে করা হয়। ... এই অঙ্গগুলো শুধু একে অপরের পরিপূরকই নয়, সেগুলোর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য, ঐক্যও রয়েছে। রয়েছে স্বার্থ, নিজস্বতা, অস্তিত্বের অভিন্নতা। ... এই ধারণাকে যদি বাঁচিয়ে রাখা না যায়, তবে জাতগুলো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠার চেয়ে সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। সেটা তাহলে বিচ্যুতিই হবে।'' (ডি উপাধ্যায়, *অখণ্ড মানবতাবাদ*, নয়া দিল্লী, ভারতীয় জনসংঘ, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৪৩)। অসাংবিধানিক ও বৈষম্যমূলক জাত ব্যবস্থার এক কট্টর সমর্থকই এখন ভারতের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক গবেষণা সংস্থার প্রধান হলেন।

যা আরও উদ্বেগের সৃষ্টি করে তা হল, রাওয়ের লেখাপত্রে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের ধ্যানধারণার স্তুতি করা হয়েছে যাঁরা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে পরিত্যাগ করে খোলাখুলিভাবে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা বলেছেন।

এটাও জানা গেছে যে, গুজরাট সরকার ব্যাপকহারে দীননাথ বাত্রার লেখা পাঠ্যপুস্তক ছেপেছে, যে পুস্তকগুলোতে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী) নরেন্দ্র মোদীর লেখা মুখবন্ধ রয়েছে এবং সেগুলোকে গুজরাটের স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে অনুপূরক পাঠ্য করে তোলা হয়েছে।

এই বইগুলোর বিষয়বস্তুকে উদ্ভট ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যেত—কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন সেগুলোকে অনুমোদন করেন এবং রাজ্য সরকার যখন করদাতাদের টাকায় সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে, তখন সেটা আর কৌতুকের ব্যাপার থাকে না। তখন সেটা সহজেই ছাপ ফেলা যায় এমন ছাত্রদের মনের সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা হয়েই দেখা দেয়।

আজ যিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন এমন সমস্ত পাঠ্যপুস্তককে সরকারিভাবে অনুমোদন করেন যেগুলো ছাত্রদের ভারতবর্ষের মানচিত্রকে প্রত্যাখ্যান করে তার পরিবর্তে প্রতিবেশী দেশ ও অঞ্চলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা সংঘ পরিবারের খোয়াবের 'অখণ্ড ভারতের' মানচিত্রকে আঁকতে শেখায়, তখন তা উদ্বেগের জন্ম না দিয়ে পারে না।

বাত্রা দাবি করেছেন, তাঁর বইগুলো 'পশ্চিমী সংস্কৃতির' বদলে 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে' এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু সেগুলোতে শুধু উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রথাগুলোরই পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যায়। তাহলে দলিত, সংখ্যালঘু বা ভারতের অন্যান্য নানা অঞ্চলের সাংস্কৃতিক লোকাচারগুলোকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলে কেন তিনি স্বীকার করেন না?

এর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার হল, তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তগুলোতে এমন সমস্ত গালগল্প রয়েছে যে কোন পেশাদার শিক্ষাবিদই সেগুলোকে ন্যক্কারজনকভাবে বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক বলে মনে করবেন। এই গালগল্পগুলোর মধ্যে একটিতে একটি কালো মানুষকে 'নিগ্রো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার তুলনা করা হয়েছে 'মোষ'-এর সঙ্গে; কালো মানুষদের চামড়ার 'আগুনে ঝলসানো রং'-এর বিপরীতে ভারতীয়দের চামড়ার রংকে বর্ণনা করা হয়েছে 'সঠিকভাবে সেঁকা রুটি'র মত; 'বিদেশীদের' তুলনা করা হয়েছে ভারতীয়দের পায়ের জুতোর সঙ্গে এবং বন্দেমাতরম নিয়ে এক মুসলিম স্বাধীনতা যোদ্ধার আপত্তি তাঁকে জাতীয়তা বিরোধী করে তুলেছে বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাত্রা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হিন্দুস্তানী শব্দগুলোর প্রতিও আপত্তি জানিয়েছেন, কেননা সেগুলোর মূল 'বিদেশী' বলে তাঁর দাবি।

এগুলো ছাড়াও তাঁর রচিত পাঠ্যপুস্তক উদ্ভট তথ্যে ভরা; যথা, প্রাচীন ভারতীয়রা মোটর গাড়ি, স্টেম সেল চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিলেন বলে পুস্তকগুলোতে দাবি করা হয়েছে।

বাত্রা গর্ব করে বলেছেন, মানব সম্পদ বিকাশমন্ত্রী পাঠক্রমে তাঁর প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলোকে চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠনের মোদী সরকারের পদক্ষেপের সমান্তরালভাবে বাত্রা একটি অসরকারি শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন, যা শিক্ষার 'ভারতীয়করণ'-এর জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

তাঁর নীরবতা ভেঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা দিতে হবে, বাত্রার আজগুবি বইগুলোর অনুমোদনে ও সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীকেও সারা দেশকে জানাতে হবে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্ন, অবৈজ্ঞানিক এবং বর্ণবাদী বিষয়বস্তুতে গুজরাট সরকারের মদত সম্পর্কে তাঁর মন্ত্রকের অবস্থান কি।

মোদী কর্পোরেটের টাকায় গুজরাট মডেলকে 'উন্নয়ন' ও 'প্রগতির' মূর্তরূপ হিসেবে তুলে ধরেন। গুজরাটের স্কুল শিক্ষার মডেল আজ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে কুৎসিত রসিকতা বলে উন্মোচিত হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি, শিবসেনার সাংসদ এক মুসলিম ব্যক্তির উপবাস ভাঙ্গাতে তাঁর মুখে জোর করে খাবার গুঁজে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মোদী সরকারকে শিক্ষার নামে দেশের ছেলেমেয়েদের আর এস এস শাখাগুলোর পৌরাণিক অতিকথা এবং মিথ্যাচারকে জোর করে গেলাতে দেওয়া যাবে না।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২৯ জুলাই ২০১৪)

কলকাতায় গণমঞ্চ আয়োজিত কনভেনশনের প্রচারপত্র

(সম্প্রতি পাঁচটি সংগঠন মিলে গঠন করা 'গণমঞ্চ' আয়োজিত যে কনভেনশন ৭ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল তার প্রস্তাবিত আলোচনাপত্রের অংশবিশেষ পড়ুন—সম্পাদক)

সাথী,

রাজ্য তথা দেশের জনগণের পক্ষে আশঙ্কাজনক এক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমরা একটি আন্দোলনমুখী মঞ্চ গঠন করেছি। ''গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার গণমঞ্চ''—সংক্ষিপ্তভাবে ''গণমঞ্চ''।

'আচ্ছে দিন' আসবে?

নির্বাচনী প্রচারের সময় বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'আচ্ছে দিন' আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকার গঠনের পর কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গলায় অন্য সুর—তিনি এখন মানুষকে 'তেতো ওষুধ' খাওয়ানোর কথা বলছেন। বাজেটের আগেই ব্যাপক হারে রেলভাড়া বৃদ্ধি এবং পেট্রোল-ডিজেলের নিয়মিত দাম বাড়ানোর হার দেখলে এই সরকারের নীতি কি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত, বর্ষাকালে খাদ্যদ্রব্যের দাম আরও বেড়েছে। সামরিক ক্ষেত্র, বীমা, রেল এবং গৃহনির্মাণের মতো স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ আরও বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আগামীদিনে ভর্তুকি এবং জনকল্যাণমূলক খাতে খরচা কমানোর ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই বিজেপি সরকার পূর্ববর্তী কংগ্রেসী সরকারের মতোই জনবিরোধী নীতি আরও উৎসাহের সঙ্গে প্রণয়ন করবে। মূল্যবৃদ্ধি রোধ, কালো টাকা উদ্ধার, দুর্নীতি দমনের মতো নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো ইস্তেহারের পাতাতেই থেকে যাবে।

বিজেপি ইতিমধ্যেই নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ অমিত শাহকে দলের নতুন সভাপতি হিসেবে বরণ করেছে। গুজরাতের এই প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি ভুয়ো সংঘর্ষের মামলায় ২০১০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে তিন মাস কারাবাস করেছিলেন। সি বি আই তাই এনার বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ ও তোলাবাজির অভিযোগ এনেছিল। ২০১৩-তে অমিত শাহ উত্তরপ্রদেশে বিজেপির দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে ঐ রাজ্যের মুজফফরনগরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বিজেপিকে ভারতের ঐ বৃহত্তম রাজ্যে রেকর্ড আসন জিততে সাহায্য করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পরিচালিত বিজেপি এখন এই 'গুজরাট মডেল'টিকে সারা দেশে কায়েম করতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ গণতন্ত্রের প্রহসন

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের সৌজন্যে দিনকে দিন পরিস্থিতির আরও অবনতি হচ্ছে—তোলাবাজি, খুন এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিদের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারে আঘাত, সরকারি মদতে বিরোধীদের ওপর হামলা এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা আজ প্রতিদিনের খবর। তৃণমূলের সাংসদ তাপস পালের বিরোধীদের উদ্দেশ্যে ধর্ষণ এবং খুনের হুঁশিয়ারি এই দলটির বিপজ্জনক চরিত্রকে আরও প্রকট করে তুলেছে। মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ নয়ছয় হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারির মতো ন্যক্করজনক ঘটনায়। একে একে বন্ধ হচ্ছে জেসপ, হিন্দমোটর, শালিমারের মতো পুরনো কারখানা। বন্ধ হচ্ছে একের পর এক চটকল। উত্তরবঙ্গের খেতে না পাওয়া চা বাগান শ্রমিকের মৃত্যুর মিছিল বেড়েই চলেছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এগুলো সব 'ছোট্ট ঘটনা'।

বেকারত্ব, কম মজুরি, মূল্যবৃদ্ধি ও ব্যাপক হারে ঠিকা প্রথার মজদুর নিয়োগ শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। কৃষকেরা চাষের উপকরণের দাম বৃদ্ধি ও ফসলের দামের সাঁড়াশি আক্রমণে অতিষ্ঠ। আদিবাসী, দলিত বা মুসলমানদের মতন সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষেরা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে।

সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট কার্যকরী বিরোধীর ভূমিকা পালন করে তৃণমূল সরকারের এই অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে লড়াই আন্দোলন সংঘটিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ করে তার মেয়াদের শেষ দশকে এস ই জেড নির্মাণ এবং জোর করে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করার মত আগ্রাসী নয়া-উদারবাদী নীতি প্রণয়ন করে। শাসক দল থাকাকালীন সি পি আই (এম)-এর তরফ থেকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে অনেক সময়েই লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে পার্টি নেতৃত্বের দুর্নীতি ও ঔদ্ধত্য ক্রমবর্ধমান হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, ২০১১ সালে নির্বাচনী পরাজয়ের পরেও সি পি আই (এম) তার মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিচ্যুতির কোনরকম শুদ্ধিকরণ করতে পারেনি।

তৃণমূল সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসন এবং সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ক্রমাগত দুর্বল হওয়ার কারণেই রাজ্যে বিজেপির সমর্থন বাড়ছে। বিজেপির উত্থান সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটিয়ে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাবে এবং রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে ধ্বংস করবে। আমরা এও বিশ্বাস করি এ হেন সাম্প্রদায়িক শক্তির মোকাবিলা কংগ্রেসের মতো প্রত্যাখ্যাত জনবিরোধী দলের লেজুড়বৃত্তি করে নয়, একমাত্র গণআন্দোলনের পথেই করা সম্ভব।

গণ-আন্দোলন মঞ্চ

আমরা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার্থে যে সম্মিলিত মঞ্চে একত্রিত হয়েছি তা নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অবস্থানের প্রতি দায়বদ্ধ ঃ

- গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা
- ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
- নয়া-উদারবাদী, বৃহৎ কর্পোরেট-মুখী আর্থিক নীতি, যা আর্থিক বৈষম্য এবং সার্বজনীন সম্পদ লুটের জন্ম দেয়, তার বিরোধিতা
- নারী, দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সামাজিকভাবে বঞ্চিত মানুষের সামাজিক ন্যায়ের দাবি
- দুনিয়া জুড়ে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতি সমর্থন এবং যুদ্ধ ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা

যে সমস্ত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দল, সংগঠন, গ্রুপ ও ব্যক্তি উপরোক্ত রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে একমত ও এই বিষয়গুলো নিয়ে লড়াই-আন্দোলন করতে প্রস্তুত, আমরা তাঁদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি হাতে হাত মিলিয়ে এই মঞ্চে যোগ দিয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করতে। আমরা রাজ্যে যে কোন গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলব এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবো। অসংগঠিত শ্রমিক, সংগঠিত শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, নারী, দলিত, আদিবাসী, মুসলিম সংখ্যালঘুদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সোচ্চার হতে এবং সমস্ত ধরণের নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অভিনন্দন সহ—**গণমঞ্চের আহ্বায়কবৃন্দ—**

আব্দুল রেজ্জাক মোল্লা, সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ।। আভাস মুন্সী, মজদুর ক্রান্তি পরিষদ
কুণাল চট্টোপাধ্যায়, র‍্যাডিকাল সোশালিস্ট।। পার্থ ঘোষ, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন
প্রসেনজিৎ বসু, লেফট কালেক্টিভ

বিহার বিধানসভা উপনির্বাচনগুলোতে
বামদলগুলো এক সাথে লড়বে

পাটনায় ২৯ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে সি পি আই (এম এল), সি পি আই এবং সি পি আই (এম) বিহার বিধানসভার উপনির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করার কথা ঘোষণা করেছে। সাম্প্রদায়িক ও কর্পোরেট ফ্যাসিবাদের মোকাবিলা করা এবং মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি ও গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের বিকল্পকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আশু প্রয়োজনীয়তা থেকেই এই ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছে বলে বামদলগুলো জানিয়েছে।

এই উপনির্বাচনগুলোতে সি পি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ২টি আসনে (জালে ও বাঁকা), সি পি আই (এম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ৩টি আসনে (ছাপরা, মহিউদ্দিননগর এবং পারবাট্টা) আর সি পি আই (এম এল) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ৫টি আসনে (নারকাটিয়াগঞ্জ, রাজনগর (তফসিলি), ভাগলপুর, হাজিপুর, মোহানিয়া (তফসিলি)।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক কমরেড কুণাল, সি পি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং এবং সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয়কান্ত ঠাকুর।

মোদী সরকার গৃহীত নীতিগুলো যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে এবং বিহারে বিজেপি যে সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন চালাচ্ছে, সেকথা উল্লেখ করে কমরেড কুণাল বলেন—কংগ্রেস, আর জে ডি এবং জে ডি (ইউ) যে জোট বানিয়েছে তা সুবিধাবাদী। কংগ্রেস সারা দেশের সঙ্গে বিহারেও চূড়ান্ত কলঙ্কিত হয়ে রয়েছে, আর জে ডি (ইউ)-র জন্যই বিজেপি বিহারে জায়গা করে নিয়ে সাম্প্রদায়িক এজেণ্ডাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারছে। আর জে ডি-র শাসনে সাম্প্রদায়িক ও জাতপাতভিত্তিক শক্তিগুলো অবাধে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে গেছে এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের গণহত্যাগুলো সংঘটিত করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া কর্পোরেটপন্থী ও দরিদ্র বিরোধ নীতিগুলো চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বিজেপি ও কংগ্রেস, জে ডি (ইউ) এবং আর জে ডি-র মধ্যে কোন ফারাক নেই বলেও তিনি অভিমত পোষণ করেন, যে নীতিগুলো সারা দেশের সঙ্গে বিহারেও বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। এই ধরনের সুবিধাবাদী জোটের পক্ষে গৈরিক বাহিনীর আগ্রাসনের মোকাবিলা করা এবং জনগণের স্বার্থ ও অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, বাম দলগুলোর মধ্যে এই ঐক্য সময়েরই দাবি এবং উপনির্বাচনগুলোতে যৌথভাবে লড়াই করার সিদ্ধান্তকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে।

কমরেড ডি প্রেমপতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

কমরেড ডি প্রেমপতির প্রয়াণে সি পি আই (এম এল) গভীর দুঃখপ্রকাশ করছে। তিনি গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষ, সামাজিক ন্যায় এবং মানব মর্যাদার পক্ষে নিরন্তর লড়াই করে গেছেন এবং ভারতীয় জনগণের নানা ধরণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলোর পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছেন। তিনি এমন একজন মার্কসবাদী ছিলেন যাঁর আম্বেদকর, পেরিয়ার ও ফুলের রচনা এবং চিন্তাভাবনার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি ছিল এবং তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ থেকে রসদ সংগ্রহ করে তিনি বলিষ্ঠভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রচারধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং সামন্ততান্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।

আমরা যারা সি পি আই (এম এল)-এর সঙ্গে যুক্ত তারা ১৯৮০-র দশকে পার্টির বহুমুখী কার্যধারা এবং উদ্যোগে, বিশেষভাবে আই পি এফ গড়ে তোলা এবং মার্কসিজম টুডে নামক মার্কসবাদী তাত্ত্বিক পত্রিকার সূচনায় তাঁর দৃঢ় অবদানের প্রিয় স্মৃতিকে সযত্নে লালন করি। তিনি মার্কসিজম টুডে পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় যে নাগভূষণ পট্টনায়ক মুক্তি কমিটি গড়ে উঠেছিল তিনি ছিলেন তার অন্যতম আহ্বায়ক এবং কমরেড নাগভূষণ জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে কমরেড প্রেমপতির ঘনিষ্ঠ ও উষ্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

কমরেডরা কোন কাজ নিয়ে যখনই তাঁর বাড়িতে গেছেন তাঁরা কমরেড প্রেমপতি ও তাঁর পরিবারের উষ্ণ আতিথেয়তা পেয়েছেন। দিল্লী কলেজ অফ আর্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক প্রজন্মের ছাত্রদের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের দরদি অধ্যাপক এবং দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে আন্দোলনের কর্মীদের কাছে তিনি এমন এক কমরেড হয়ে দেখা দিয়েছিলেন যাঁর কাছ থেকে দিশা ও সহযোগিতা পাওয়ার ভরসা করা যেত।

ইন্দিরা গান্ধি হত্যার পর শিখ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চালিত ভয়াবহ গণহত্যাই হোক, আর মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণের বিরুদ্ধে নামিয়ে আনা জাতপাতগত উন্মাদনা, বাবরি মসজিদের বর্বরোচিত ধ্বংস এবং গুজরাটে ২০০২ সালে রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট গণহত্যার আগে ও পরে সংঘটিত দাঙ্গাই হোক—সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিবাদ সভাগুলোতে কমরেড প্রেমপতিকে সুস্থ চিন্তা, সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারের সপক্ষে এক নির্ভীক ও অক্লান্ত প্রচারক হিসাবে দেখা যেত।

ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমরা কমরেড প্রেমপতিকে হারালাম। কষ্টার্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক মর্যাদা এবং বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের রক্ষায় আজ যখন আমরা সমবেতভাবে লড়াই চালাচ্ছি তখন তাঁর অভাব গভীরভাবেই অনুভূত হবে। তবে, তাঁর রচনাগুলো এবং স্মৃতি দেশকে আরও ভালোভাবে উপলব্ধি করতে এবং সামাজিক রূপান্তরণ ও মানব মর্যাদার কাঙ্খিত লক্ষ্যে দৃঢ়তর লড়াই চালাতে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে চলবে। সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আমি কমরেড প্রেমপতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। সুন্দর আগামীদিনের জন্য আমাদের সমস্ত সংগ্রামে তাঁর অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সক্রিয়তার উত্তরাধিকার বেঁচে থাকবে এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাবে।

- দীপঙ্কর ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক
সি পি আই (এম এল)

গাইঘাটায় পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির উত্তর ২৪ পরগণা শাখার কনভেনশন

জেলার গাইঘাটা ব্লকের ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সম্মিলনী সভাঘরে পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমতির উত্তর ২৪ পরগণা শাখার আয়োজনে পাটচাষী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনভেনশনে গৃহীত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

সারা বিশ্বে পাট উৎপাদনে প্রথম বাংলাদেশ, তারপর ভারত। ভারতের মধ্যে পাট উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। পাট থেকে পাট জাত জিনিষ তৈরীর জন্য গঙ্গার পাড়ে গড়ে উঠেছিল বহু পাটকল। সারা বাংলায় ৮২টি পাটকলের মধ্যে হুগলী, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ৫৮টি পাটকল আছে পশ্চিমবঙ্গের ৫৭৭ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। একর প্রতি একজন কৃষক চাষ করলে ১৭,৩১,০০০ মানুষ এর সাথে যুক্ত। পরিবারে ৫ জন হলে ৮৬,৫৫,০০০ মানুষ যুক্ত। এবার অনাবৃষ্টির কারণে যেমন পাট চাষের ক্ষতি হয়েছে, তেমনি পাট ভেজানোর সমস্যা তৈরী হয়েছে। বে-আইনিভাবে খাল, বিল, পুকুর ভরাটের হিড়িক লেগেছে। ফলে জলের কারণে ভালো মানের পাট তৈরী হবে না। অনুন্নত মানের পাটের বাজার দাম কম। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার কুইন্টাল প্রতি পাটের মূল্য ঘোষণা করেছিল ২৪০০ টাকা। যদিও পাটের মান (গ্রেড) অনুযায়ী পাটের মূল্য ঠিক হয়। তেমনি পাট ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দামটা চড়া হিসাবে পাওয়া যায়। ব্যাপক পাট উঠলে দাম কমে যায়। পাট ঘরে রেখে বাজার বুঝে বিক্রি করতে পারলে চড়া দাম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে গরিব-মাঝারি কৃষকরা বাধ্য হয়ে পাট বিক্রি করে। তখন পাটের দাম থাকে পড়তি। কমবেশী ৪ মাস লাগে পাট চাষ করতে (চৈত্রের ১৫ তারিখ থেকে শ্রাবণের ১৫ তারিখ পর্যন্ত)। দেখা যাচ্ছে বিঘা প্রতি গড়ে ১৬,০০০ টাকা পাট চাষে খরচ। বিঘাতে গড়ে ৪ কুইন্টাল পাট হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ৪ কুইন্টাল পাটের মূল্য পড়বে ৯,৬০০ টাকা। দেখা যাচ্ছে পাট চাষে চাষীর কোথাও লোকসান কোথাও সামান্য লাভ। জে সি আই-এর দোকানের সংখ্যা ব্লকে ১টি, কোথাও নেই। থাকলেও প্রকৃত কৃষকের কাছ থেকে পাট কেনার পরিবর্তে ফড়ে মহাজনদের কাছ থেকে পাট কেনে। যখন বাইরের বাজার থেকে জে সি আই-এর দাম বেশী থাকে। তাছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা চাষীর পাট নিয়ে টালবাহানা চলে। বহু কৃষক বিফল হয়ে মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন। আর ফড়ে মহাজনরা জে সি আই-এর ম্যানেজারের সঙ্গে চুক্তি করে পাটের লাভজনক দামটা পকেটস্থ করে। তবে এটাও দেখা যাচ্ছে জে সি আই থেকে বাইরের বাজারে মজুত করে রাখা পাটের দাম বেশী পাওয়া যায়। পাট চাষের সাথে পাটকল যুক্ত। পাট না হলে যেমন পাটকল অচল, তেমনি পাটকল না চললে কৃষক ও কৃষি অচল। বর্তমানে কখনও পাটকল চলছে-বন্ধ হচ্ছে-আবার খুলছে। খোলা পাটকলে শ্রমিকের কাজের ঘন্টা কমিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ৬টি পাটকল বন্ধ। এর ফলে ৩৫,০০০ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। শ্রমিক পরিবারের ১,৭৫,০০০ মানুষ নিরন্ন অবস্থায় আছেন। চটকলে ২,০০,০০০ বেল পাটের বস্তা পড়ে আছে। বাজার নেই, বিক্রি নেই। এই রাজ্য থেকে চটের ২৪,০০,০০০ বেল বস্তার মধ্যে পাঞ্জাব একাই ১৪,০০,০০০ বেল বস্তা কেনে। এবার তারা অর্থের অভাবে কিনবে না বলে জানিয়েছে। কৃষক বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও পাটের বস্তা কিনছে না। আসল কারণটা হল গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৪০ শতাংশ সিনথেটিক বস্তা ব্যবহারের অনুমোদন করেছেন। ফলে চটের বস্তার চাহিদা কমে গেছে। খোদ দেশের সরকার (কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য) খাদ্য বস্তু—চাল, চিনি, গম, পেঁয়াজ ইত্যাদি ব্যবহারে ১০০ ভাগ চটের বস্তা লাগাচ্ছে না। বেসরকারি পুঁজিপতিরা তো আরও করছে না। সরকার কৃষক স্বার্থ না দেখে সিনথেটিক বস্তা ব্যবহারের একটা বাজার তৈরী করে দিল একচেটিয়া কয়েকজন পুঁজিপতিদের স্বার্থে। বর্তমান মোদী সরকার পাট চাষের দুরবস্থার সুযোগ দিয়ে পাটের জমি বড় বড় পুঁজিপতিদের (কর্পোরেটদের) হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা জমিতে পাট উৎপাদন করে একলপ্তে বড় এলাকা জুড়ে পাট ভেজানোর ব্যবস্থা করবে সেখানে জলে এক ধরণের ওষুধ (এনজাইম) ব্যবহার করে সাত দিনের মধ্যে পাট ছাড়ানোর কাজ শেষ করবে এবং পাট ছাড়াতে এমন যন্ত্র ব্যবহার করবে তাতে মজুরও লাগবে কম। মোটা মুনাফা কামাবে।

একদিকে গ্রাম-শহরে মানুষের মারণ রোগ তৈরী হচ্ছে তার বিভিন্ন কারণ আছে। তবে তার মধ্যে খাদ্য উৎপাদনে খাদ্যে যেমন বিষক্রিয়া হচ্ছে বীজের বংশ পরিবর্তন করে ক্ষতি ডেকে আনা হচ্ছে, উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্য গুদামজাত করার জন্য সিনথেটিক বস্তা ব্যবহার খাদ্যের মধ্যে এক ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় যার ফলে সেই খাদ্য মানুষের শরীরে ক্ষতি ডেকে আনবে। খাদ্যের সুরক্ষা করতে চাই এসবের উপর নিষেধাজ্ঞা।

কৃষকের বাঁচার দাবি

১। ৫০০০ টাকা কুইন্টাল দরে সরকারকে পাট কিনতে হবে।

২। ব্লকের বড় বড় হাটগুলোতে জে সি আই-কে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে পাট কিনতে হবে।

৩। খাদ্যদ্রব্যে সিনথেটিক বস্তা ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হবে এবং ১০০ ভাগ চটের বস্তা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৪। অবিলম্বে কৃষক স্বার্থে বন্ধ পাটকল খুলতে হবে।

৫। কৃষকদের দাবি নিয়ে কৃষকদের এক হতে হবে। মজবুত কৃষক সংগঠন করতে হবে।

৬। কৃষক সমিতির সদস্য হতে হবে। আন্দোলনের জন্য তহবিল গঠন করতে হবে।

কনভেনশন পরিচালনা করেন সুবোধ দাস সহ চার সদস্যের সভাপতিমণ্ডলী। কনভেনশনের শুরুতে প্রতিবেদন পাঠ করা ও এর সাথে পাটচাষের একটি পরিসংখ্যান পড়ে শোনানো হয়। কনভেনশনে ৫ জন পাটচাষী বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বক্তব্য পেশ করেন কৃষিমজুর সমিতির জেলা সম্পাদক অজয় বসাক, এ আই সি সি টি ইউ নেতা নবেন্দু দাশগুপ্ত, সি পি আই (এম এল) লোকাল কমিটির সম্পাদক কার্তিক দে এবং পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমিতির জেলা আহ্বায়ক কৃষ্ণ প্রামাণিক। প্রত্যেক বক্তা কনভেনশনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে এবং পাটচাষীদের আজকের দাবিগুলোতে আন্দোলনমুখী হতে তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। আশা করা যায় এই কনভেনশন নিশ্চয় ছাপ ফেলবে।

"আজকের দেশব্রতী" সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত

ইংরাজী সাপ্তাহিক "আপডেট"

গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

আন্দোলনের পথে "নাগরিক সমন্বয় - হিন্দমোটর"

হিন্দমোটর শহরের রাধাগোবিন্দনগর এলাকার এক তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় শুরু থেকেই বিবেকবান, প্রতিবাদী নাগরিকদের এবং সি পি আই (এম এল) ও বিভিন্ন গণসংগঠনগুলোর প্রতিবাদী স্পর্ধা দেখেছে অপরাধী ও প্রশাসনের দুষ্টচক্র। এই প্রতিবাদী আলোড়নকে আরও ব্যাপক সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলনের রূপ দিতে গত ৩ আগস্ট হিন্দমোটর নন্দনকাননের 'জ্যোতি' সভাগৃহে এক নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেয় এ আই এস এ, এ আই পি ডব্লু এ এবং আর ওয়াই এ। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিকাল থেকেই নাগরিকেরা ভিড় জমান সভাগৃহে। অনুষ্ঠান শুরুর সময় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায় ঘর, এমনকি ঘরের বাইরে

বক্তব্য রাখছেন নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা প্রদীপ সরকার বসে আছেন সভাপতিমণ্ডলী।

টাঙ্গানো জায়ান্ট স্ক্রীনের সাহায্যে রাস্তায় ভিড় করে বহু মানুষ দেখতে থাকেন এই প্রতিবাদী কর্মসূচী। মূলত এলাকার সমস্ত নাগরিককে এই প্রতিবাদী কর্মসূচীতে সামিল করানোই ছিল উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য এবং তারা জানান যে আগামী দিনে এই আন্দোলনকে হিন্দমোটরের প্রতিটি বাড়িতে ছড়িয়ে দিতে যদি প্রয়োজন হয় তাদের সংগঠনের ব্যানার সরিয়ে রাখতেও তারা রাজী আছেন। দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত এলাকাবাসী ও অতিথিবৃন্দ উদ্যোক্তাদের এই আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টাকে হাত তুলে স্বাগত জানান।

আগত সমস্ত নাগরিকের ও অতিথির স্পষ্ট অবগতির জন্য আর ওয়াই এ-র পক্ষ থেকে আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক অপূর্ব ঘোষ আরও একবার ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা এবং সেই ঘটনাকে আড়াল করতে অপরাধী প্রশাসন ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব আগাগোড়া কিভাবে চেষ্টা করেছে তা বিশদে তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে আরও জোরে সোচ্চার হতে সকলকে আহ্বান জানান। সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে স্বপন মজুমদার প্রস্তাবনা পাঠ করেন এবং উপস্থিত সকলের মতামত ও পরামর্শ জানাতে আবেদন করেন। শোভা চৌধুরী সহ নির্যাতিতা তরুণীর বেশ কয়েকজন প্রতিবেশী সেই তরুণী ও তার পরিবারের সাথে তাদের হৃদ্যতার কথা এবং এই ঘটনায় তাদের মর্মবেদনা ও তীব্র প্রতিবাদী আকাঙ্খার কথা তুলে ধরেন। নির্যাতিতা একজন মহিলা দীপা রায় কিভাবে পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াই করছেন মহিলা সমিতিকে পাশে পেয়ে তা উল্লেখ করেন। উপস্থিত ছিলেন কামদুনি প্রতিবাদী মঞ্চের দুই অন্যতম সংগঠক ভাস্কর মণ্ডল ও শিক্ষক প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, সুটিয়ার 'আক্রান্ত আমরা' মঞ্চের সংগঠক ও শহীদ বরুণ বিশ্বাসের দাদা অসিত বিশ্বাস, বালির 'জলাভূমি রক্ষা আন্দোলনের' শহীদ তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত, গণউদ্যোগ-এর সম্পাদক অচ্যুত সেনগুপ্ত, এ পি ডি আর-এর বিশ্বজিৎ দাস এবং হিন্দমোটর কারখানার সংগ্রামী শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষে আভাষ মুন্সী। প্রত্যেকেই এই কর্মসূচীকে সাধুবাদ জানিয়ে এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানান এবং এলাকার নাগরিকদের অংশগ্রহণ দেখে তারাও উৎসাহিত বোধ করছেন একথা বলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং সর্বমোট ২০ জন বক্তা রাজ্য জুড়ে আইন-কানুন এবং প্রশাসন ও অপরাধী দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ধর্ষিতা তরুণীর পরিবারের আইনজীবি প্রসেনজিৎ মাইতি বলেন, আমি আইনজীবি হলেও একজন বিবেকবান নাগরিক হিসাবে বলতে পারি যে আজ টাকা যার—আইন তার। কাজেই আইন আইনের পথে চলুক, তবুও আপনারা শুধু সেই ভরসায় না থেকে যতরকম উপায়ে সম্ভব সংগঠিত হোন প্রশাসন-আইন-আদালত ও অপরাধীদের থেকে হিসাব বুঝে নেওয়ার জন্য। উপস্থিত সকলেই কনভেনশনের প্রস্তাবনার প্রতি সহমত পোষণ করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী মঞ্চ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দাবি করেন। আইসার সম্প্রীতি দেশব্যাপী মহিলাদের নিঃশর্ত নির্ভয় স্বাধীনতার আন্দোলনের নানা দিক তুলে ধরে হিন্দমোটরকে সেই আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠার আহ্বান জানান। সর্বসম্মতিক্রমে গড়ে ওঠে "নাগরিক সমন্বয়-হিন্দমোটর (শ্রীরামপুর মহকুমা)", যার প্রাথমিক আহ্বায়ক থাকছেন হিন্দমোটরের দুই বর্ষীয়ান সংগঠক নাগরিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী স্বপন মজুমদার ও বিশ্বজিৎ দাস। পরবর্তীতে এই মঞ্চ ও কমিটিকে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকের কাছে আরও সম্প্রসারিত করে হিন্দমোটরের এই আন্দোলনকে আরও সর্বাত্মক করার শপথ নেওয়া হয়।

কনভেনশন সঞ্চালনা করেন আইপোয়ার চৈতালী সেন ও আইসার সৌরভ রায়। আগামী কর্মসূচী স্থির হয়েছে, ১৬ আগস্ট অপরাধীদের কোর্টে তোলা হলে কোর্ট চত্বরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ এবং আগামী ২৪ আগস্ট বিকাল ৫টায় হিন্দমোটর বিবাদীবাগ মোড়ে জমায়েত হয়ে সমগ্র হিন্দমোটরব্যাপী এক মুখর প্রতিবাদী নাগরিক মিছিল সংগঠিত করা হবে। সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে "নাগরিক সমন্বয়-হিন্দমোটর"।

বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলা সাহিত্যের কেয়ারি করা ফুলবাগানে নবারুণ যেন ফণিমনসার বেয়াড়া ঝাড়

সব লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। একটি একটি করে।

সরকারি কোপে শুয়োরের দল। আদিগঙ্গা পেরিয়ে কাদামাখা শুয়োরের পালের পলায়নদৃশ্য মনে করিয়ে দিতে পারে ডানকার্কে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ইতিহাসখ্যাত 'পশ্চাদপসরণ'কে। আবার নেহাত বরাতদোষে যে শুয়োররা ধরা পড়েই গেল, তাদের ঠাঁই হয়েছে মশারি, টেবিলফ্যান, সিসিটিভি সম্বলিত ফাইভ স্টার কয়েদখানায়। কলকাতা শহরের খাল, নর্দমা, বর্ষায় গলে যাওয়া বস্তিগুলোয় শুয়োরের মতো গাদাগাদি করে বাস করা মানুষগুলোর অবশ্য এত সৌভাগ্য হয়নি। মশা-মাছি-চোলাই-সাট্টা নিয়ে তাদের জীবন আগের মতোই কাদাঘোলা জলে বহমান।

'কাঙাল মালসাট'-এ ফ্যাতাড়ু ও চোক্তারদের যৌথ বিপ্লবের সূচনার আগে এমনই হাড় হিম করা কিছু ঘটনা পর পর ঘটে চলেছিল। কাকতালীয় কি না জানি না, নবারুণ ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রাকমুহূর্তে এমনই কয়েকটা বিচিত্র দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল শহর কলকাতা ও গোটা বিশ্ব। তা না হলে কী ভাবেই বা ব্যাখ্যা করা যায় গাজায় ঈদের দিনটাকে? বন্ধুদের নতুন জামা-জুতো দেখাবে বলে রাস্তায় বেরিয়ে যে ছোট্ট মেয়েটা আর ঘরে ফিরতে পারল না, নতুন জামার রক্তমাখা লেসের টুকরো দেখেই তো ধ্বংসস্তূপ থেকে তাকে চিনতে পেরেছিলেন বাবা। অথবা, মেজর বল্লভ বক্সীর মতোই ইজরায়েলের মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে নুনু কামানের খুচরো গোলায় গাজায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে চলেছে হামাস।

নবারুণের মৃত্যুর জন্য তাঁর মতো করেই মঞ্চটাকে সাজানোর কাজ সম্পূর্ণ করেছিল অলক্ষ্যে থাকা কেউ একজন। সে ঠিক কে, তাকে খোঁজার কোনও সচেতন প্রয়াস কোনও দিনও করেননি নবারুণ। কিন্তু তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায় তার অমোঘ উপস্থিতি। তার অঙ্গুলিহেলনেই কাঙালদের মালসাটে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বড়িলাল। অথবা, ফ্যাতাড়ুরা মন্ত্র পড়ে ঘুড়ির মতো আকাশ উড়াল দেয়। নবারুণের সাহিত্য ও জীবনযাপনে এই অলক্ষ্যে থাকা কেউ একজন হল ইতিহাস, মহাকাল। তাঁর গোটা জীবন, তাঁর সাহিত্য, এমনকি তাঁর মৃত্যুতেও যার স্বাক্ষর প্রতি ছত্রে ছত্রে। ইতিহাসের সঙ্গে নবারুণের যোগাযোগ আজন্ম। সদ্যোজাত স্বাধীন ভারতের সন্তান তিনি। বাঙালি মেধার দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, বিজন ভট্টাচার্য ও মহাশ্বেতা দেবীর একমাত্র সন্তান নবারুণ পারিবারিক সূত্রেই পেয়েছিলেন প্রতিবাদ আর সৃজনশীলতার অভিজ্ঞান। বাবা বিজন ভট্টাচার্যের প্রভাব তাঁর বেড়ে ওঠার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু তাঁর মাতৃকুল, বিখ্যাত ঘটক পরিবারের উত্তরাধিকারকেও সগৌরবে বয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। বিশেষত, ঋত্বিক ঘটকের। দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশের বহরমপুরে ১৯৪৮ সালে তাঁর জন্ম। কিন্তু বিজন ও ঋত্বিকের সূত্রে সেই খণ্ডিত বাংলাদেশের জন্য আমরণ একটা তিরতিরে যন্ত্রণা বয়ে গিয়েছে তাঁর ধমনীতে। ছিন্নমূল, যন্ত্রণাদীর্ণ ঐ বাংলাদেশই কখনও সোভিয়েত রাশিয়া, কখনও গাজা-প্যালেস্তাইন, কখনও কম্বোডিয়ার অখ্যাত গ্রাম, কখনও বা আদিগঙ্গার তীরবর্তী কলকাতা হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। এ এমন এক ভূখণ্ড, যেখানে মানুষকে চেনা কঠিন মানুষ হিসেবে। কখনও তারা মুণ্ডহীন বিকৃত লাশ, কখনও তারা পুলিশের বুলেট বুকে নিয়ে পড়ে থাকা তরুণ স্বপ্ন, কখনও নাম পরিচয়হীন খুলির পাহাড়, কখনও ডানা মেলা ফ্যাতাড়ু।

নবারুণের লেখায় বাস্তব ও পরাবাস্তবের এমন বিচিত্র গুরুপাক বাংলা সাহিত্যে একক ও বিচ্ছিন্ন। বস্তুত এই বিচ্ছিন্নতাই বোধহয় সাহিত্যিক ও ব্যক্তি নবারুণের একমাত্র পরিচয়। বাংলা সাহিত্যের কেয়ারি করা বাগানে তিনি যেন বেয়াড়া এক উপদ্রব। রাজবাড়ির বাগানে, বাবুর মর্জিমাফিক কাটছাঁট করে নেওয়া ঘাসের গালিচা আর মেরুদণ্ডহীন লতানে গাছের ভিড়ে তিনি যেন উৎকটভাবে মাথা তোলা এক ফণিমনসার ঝাড়। সর্বাঙ্গে কাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিঃসঙ্গ। নবারুণের সাহিত্যের আকাশ শরতে মেঘের ভেলা ভাসানো সুদৃশ্য চিত্রকল্প নয়। তাঁর সাহিত্যের আকাশ ঘোলাটে, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কখনও কখনও সেই আকাশ বেয়ে নেমে আসে প্যারাসুটে ঝোলানো নিউক্লিয়ার বোমা অথবা পাঁঠার মাথার পচা ঘুগনির ভাঁড়। এমন বিচিত্র ও বহুগামী সাহিত্যিককে যে তাঁর সমকাল ও সমসাময়িকরা সব সময় বুঝে উঠতে পারবেন না সেটাও খুব একটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। খ্যাতির প্রলোভন, স্বীকৃতি, অনানুকূল্যে বা রাজপ্রসাদের কাছে নুয়ে পড়াই যখন বাংলা সাহিত্যের প্রধান চালিকাশক্তি, সে সময় মেরুদণ্ডটি সোজা রেখে, প্রতিষ্ঠানকে সোচ্চারে দূরে ঠেলে নবারুণ যে গত চার দশক ধরে নিজের মতো করে লিখে গিয়েছেন এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তাঁর নিজস্ব একটি পাঠকসমাজ তৈরি করতে পেরেছেন সেখানেই তাঁর সাফল্য। এবং সেই কারণেই বাংলা সাহিত্যে তিনি অনন্য।

বামপন্থা ও বামপন্থী আন্দোলন তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অন্যতম ভরকেন্দ্র। দূরে বসা দর্শকের দৃষ্টিতে নয়, বামপন্থাকে তিনি দেখেছেন একজন ইনসাইডার হিসেবেই। তাঁর নিজের কথায় 'রাজনৈতিক—এই কথাটা আমি সবসময়েই একটা দার্শনিক অবস্থান থেকে দেখি, অস্তিত্বর যথার্থতা বজায় রাখার একটা তাগিদ সেখানে থাকে, অস্তিত্বর ভেতরে ও বাইরের যে বিস্ফোরক অন্ধকার ও জায়মান আলো রয়েছে সেটাকে মেনে নিয়েই' (মুখবন্ধ, অন্ধবেড়াল ও অন্যান্য গল্প, জানুয়ারি ২০০৯)। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৮ সালে 'ভাসান' গল্পে যে নবারুণ আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি অনেক বেশি বিজন ভট্টাচার্যের সন্তান। কলকাতা শহরের হাঘরে, পাগল, ভিখারি মানুষকে নিয়ে লেখা তাই তাঁর পক্ষে অনিবার্য ছিল। বরং এর অনতিপরে কবিতায় যে নবারুণকে দেখতে পাওয়া যায়, তিনি সত্তরের দশকের রাগী তরুণ, বিশ্বজোড়া যুদ্ধ-ধ্বংস ও বামপন্থী আন্দোলনের আগুনে পুড়ে তপ্ত কাঞ্চনের মতো উজ্জ্বল। ১৯৭২ সালের মে মাসে লেখা 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না' কবিতাতে যে নবারুণ ধরা দেন তিনিই আমরণ আমাদের সঙ্গে রয়ে গেলেন। কালের অদ্ভুত নিয়মে তাঁর অন্তিম সময়টিতেও পৃথিবী বড় বেশি মৃত্যুগন্ধে ভারাক্রান্ত। সম্ভবত সেই কারণেই সময়ের আগেই এই মৃত্যু উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে হল তাঁকে।

ষাট ও সত্তরের দশকের আগুনে সময়ে বামপন্থী আন্দোলনকে সামনে থেকে দেখেছেন তিনি। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের স্বপ্ন দেখা তরুণ নবারুণ প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করেছেন সোভিয়েত ইনফর্মেশনে। সেই সূত্রে সোভিয়েত রাশিয়াকে অনেক বেশি কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে তাঁর। ঠাণ্ডা যুদ্ধ, বার্লিন প্রাচীরে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যাওয়া বিশ্বকে তিনি দেখেছেন তার ভালো ও খারাপ দুটো চশমা দিয়েই। ১৯৮৪ সালে সংক্ষিপ্ত মস্কো ভ্রমণে কমিউনিস্ট রাশিয়ার ঘুণধরা চেহারাটা আরও প্রকট হয়েছে তাঁর চোখে। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা সত্ত্বেও সেই রাশিয়া এসে দাঁড়িয়েছে অনিবার্য ভাঙ্গনের মুখে। এর পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতনের পর রুশ সংবাদ সংস্থার চাকরিটিও খোয়ান তিনি। বিশ্বজোড়া কমিউনিজমের পতনের সঙ্গে মিশে যায় তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিও। পরবর্তী সময়ে চিনে গিয়েও প্রায় একই অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর। তবে সোভিয়েত জমানার অন্তিম পর্বে ভঙ্গুর রাশিয়া আর সমাজতন্ত্রের মোড়কে পুঁজিবাদী ঝলমলে চীন—দুই দেশেই যে তাঁর স্বপ্নের সাম্যবাদের মৃত্যু হয়েছে তা বুঝতে সময় লাগেনি তাঁর।

কমিউনিজমের পতনকে মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি মনে করতেন নবারুণ। কিন্তু আস্থা হারাননি বামপন্থায়। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল দুনিয়ার হেরে যাওয়া, মার খাওয়া, অন্ধকারে বাস করা পোকামাকড়ের মতো মানুষেরা একদিন গর্জে উঠবেই। তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে কানাগলি থেকে আকাশে উড়াল দিয়েছিল ফ্যাতাড়ুর দল। তাদের আয়ুধও তাদেরই মতো। পচা নর্দমার জল, ভাঙা ভাঁড়ের টুকরো, সেলুনের কাটা চুলে বা মর্চে পড়া পুরোনো ছুরি দিয়েই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ার সাহস দেখায় ফ্যাতাড়ু আর চোক্তার বাহিনী। কিন্তু এমন অসম লড়াইয়ের ফলাফল নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না তাঁর। কেবলমাত্র স্থবিরতাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে, স্থিতাবস্থার সঙ্গে অন্তর্ঘাত করতে পারাতেই ফ্যাতাড়ুদের সাফল্য। বস্তুত নয়ের দশকের গোড়ায় আবিশ্বে কমিউনিজমের যে পতনকে ট্র্যাজেডি মনে করেছিলেন নবারুণ, পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকের বামপন্থী সরকারের পতনের সময় সেটাই তাঁর চোখে হয়ে উঠেছিল চরম কমেডি। একেবারে প্রবচন মেনেই। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিনগুলোতেই নানা ঘটনাক্রমের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে ফ্যাতাড়ুদের বিচিত্র কার্যকলাপ।

তবে নবারুণের সাহিত্য মানেই ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক বা কুম্ভীপাক ভেবে ভুল করার লোকের অভাব নেই এই বঙ্গদেশে। তাঁদের দোষ দেওয়াও যায় না। নবারুণের মতো কৃপণ লেখকের, ক্ষীণতরু গল্প বা কবিতার বইগুলো অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গিয়েছে। বৃহৎ প্রকাশনা সংস্থার প্রচারের আলো থেকে সচেতনভাবে নিজেকে দূরে রাখা নবারুণ নিজের সীমিত গণ্ডির মধ্যেই তাঁর যে পাঠকবৃত্ত গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা বরাবারই সংখ্যায় কম। কিন্তু সেই বেড়াটা ভেঙে গিয়েছিল ১৯৯৫ সালে 'হারবার্ট' প্রকাশের পর। ষাট-সত্তরের উত্তাল কলকাতায় অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া ছেলেদের দল, যারা অকালে মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল, সেই ভূতেদের সঙ্গেই তো কথা বলে হারবার্ট। এই উপন্যাসের আকাশছোঁয়া সাফল্য, তার প্রথাভাঙা ভাষা নবারুণকে বাঙালি পাঠকের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল অনেকটা। এই উপন্যাস তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল পুরস্কারের স্বীকৃতি। নরসিংহ দাস, বঙ্কিম, এমনকি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারও। কিন্তু ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে গুলি চালনার প্রতিবাদে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের দেওয়া বঙ্কিম পুরস্কার তার অর্থমূল্য সমেত ফিরিয়ে দিতে এক মিনিট সময়ও নষ্ট করেননি তিনি। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পরবর্তী সময়ে বাংলার বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে পথে নেমেছিলেন তিনিও। মনে প্রাণে কমিউনিস্ট হয়েও তিন দশকের বামফ্রন্টের অপশাসন থেকে রাজ্যের মুক্তির জন্য সুর চড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু 'পরিবর্তন'-এর পর আবার নিজের নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতায় ফিরে এসেছেন। লাল বা সবুজ, দুই জমানাতেই শাসকের সন্দেহের তালিকায় উপরের দিকে থেকেছে তাঁর নাম।

হারবার্ট বাংলা সাহিত্যে যে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল তার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে বাস বেঁধেছে আগুন। হারবার্ট সেই ঠাসা বারুদে একটা দেশলাই কাঠি ছুড়ে দিয়েছিল খালি। কথা সাহিত্যিক হিসেবেই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন নবারুণ। কিন্তু তাঁকে চেনার চাবিকাঠি তাঁর কবিতা। যে কবিতাকে তিনি রাষ্ট্রের দিকে কামানের গোলার মতো ছুঁড়ে দিয়েছিলেন ১৯৭২-এ, সেই কবিতাই ২০১৩-তেও একইরকম অগ্নিবর্ষী, মৃত্যুর একবছর আগেও।

কোথায় গেলে শান্তি পাবে বুকের মাঝে রক্তনদী
কোন আড়ালে মুখ লুকোবে সারাটা দেশ শহীদ বেদী
রক্তপলাশ দু-হাত ভরে ফুটছে ফুটুক, হে রাত্রিদিন
আগুন জ্বলুক, আগুন জ্বলুক, আগুন জ্বলুক বিরামবহীন। ...

(এদেশে, বুলেটপ্রুফ কবিতা, ২০১৩)

দু-হাত ভরা রক্তপলাশ আর দু-চোখ ভরা আগুন নিয়ে নবারুণ বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন আলপথের সূচনা করে দিয়ে গেলেন। কেয়ারি করা ফুলের বাগান এড়িয়ে, চোরাকাঁটায় ভরা সেই পথে আগামী দিনে বাংলা সাহিত্য এগিয়ে যাবে কি না, তার উত্তর দেবে ভাবীকাল।

- সংঘমিত্রা রায়

লেখার নন্দন ঃ নবারুণ ভট্টাচার্য

কবি তখন শায়িত পিস হেভেনের মেঝেতে। একটু পরেই বরফ কফিনে তিনি আচ্ছাদিত হবেন। তারপর কাল শেষ যাত্রা। আমরা দাঁড়িয়ে আছি কবিকে ঘিরে। নিমীলিত তাঁর চোখ। মুখখানি শান্ত। দীর্ঘ রোগভোগের ক্লান্তির সব চিহ্ন তখন উধাও সেখানে থেকে। যে মৃত্যু উপত্যকা তার দেশ ছিল না, আপাতত সেখানেই তিনি। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছিল তাঁকে পড়ার কথা, তাঁর ঋজু স্বল্প স্পষ্ট কথাগুলোতে আন্দোলিত হওয়ার কথা। মনে পড়ে যাচ্ছিল নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর সেই অমোঘ উক্তি, ''আমি লেখার ব্যাপারটা যেভাবে বুঝি সেটা নিছক আনন্দ দেওয়া বা নেওয়া নয়। আরও গভীর এক অ্যালকেমি যেখানে বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়েছে।'' একটা বিকল্প রণনীতি ছিল তাঁর সুখপাঠ্য আখ্যান থেকে নিজের লেখাকে পৃথক করার। একটা গভীর বিশ্বাস থেকে সেই রণনীতি তৈরি হয়েছিল। ''পৃথিবীর শেষ কমিউনিস্টের মৃত্যু হলেও ... সারা দুনিয়া জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। হ্যাঁ আসবে। তবে তার জন্যে আগামী সতোরো বছর বা তারও বেশি সময়ের প্রত্যেকটি ঘন্টা ও প্রত্যেকটা মিনিট কাজে লাগাতে হবে। সারা পৃথিবী জুড়ে কমিউনিস্টরা ফিরে আসবে। আসবেই। আর দশ নয়, দশ হাজার দিন ধরে দুনিয়া কাঁপবে।'' সাহিত্যের কোন ভূমিকা পালনের জন্য কবি কলম ধরেছিলেন তা জানিয়ে একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন, ''মানুষের এগিয়ে চলার, শোষণমুক্তি ও সমাজব্যবস্থা পাল্টানোর মডেল, পুঁজি ও প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ও বামপন্থীদের আবশ্যিক আত্মসমীক্ষার অভাবের কারণে অনেকটাই তছনছ হয়ে গেছে। যে শতক

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরোজ দত্ত স্মরণে আলোচনা সভা

৫ আগস্ট ভারতসভা হলে কমরেড সরোজ দত্ত স্মরণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে শহীদ সরোজ দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি। বিষয়বস্তু ঃ **নকশালবাড়ী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতের কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তন।** বক্তা 'অনীক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রী প্রণব দে।

শ্রী প্রণব দে তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভেই বলেন, নকশালবাড়ীর কৃষক সংগ্রাম ভাগচাষীর অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে অনেক মহলেই। এ প্রসঙ্গে নকশালবাড়ীর ভাগচাষী অন্যতম লড়াকু ব্যক্তিত্ব বিগলু কিষাণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। অবশ্যই নকশালবাড়ীর পূর্বসূরী হিসেবে তেভাগা ও তেলেঙ্গানা কৃষক সংগ্রামের উল্লেখ করতেই হবে। প্রণববাবুর মতে বস্তুতপক্ষে তেভাগা-তেলেঙ্গানা ও নকশালবাড়ীর মধ্যে এক যোগসূত্র বর্তমান রয়েছে। মূলত এই সংগ্রামগুলোর বর্শামুখ নিহিত ছিল সামন্ততান্ত্রিক বা আধাসামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে বিশেষ করে '৫০ ও '৬০-এর দশকে বৃহৎ জোতদার ও ভূস্বামীদের হাতে কৃষিজমির সিংহ ভাগ কুক্ষিগত থেকে গিয়েছিল। কৃষকদের মধ্যেও ছিল বিভিন্ন স্তর বিভাগ—ধনী, মধ্য ও গরীব কৃষকেরা।

শ্রী দে তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে '৬০ এ '৭০-এর দশকের বিস্তৃত পরিসংখ্যান এন এস এস ও-সেনসাস ইত্যাদির উদাহরণ দেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে। তাঁর মতে এই সময়কালে ক্রমাগতভাবে কৃষিজমির কেন্দ্রীভবন ও সেইসঙ্গে প্রান্তিক চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল অন্যতম মুখ্য বিষয়। তাঁর বক্তৃতার মধ্যে আরও আলোচিত হয়েছে কিছু অর্থনীতিবিদদের মতামত; যেমন অমিত বসু-দীপঙ্কর বসু ও যথাক্রমে অমিত ভাদুড়ীর কথাও। ভূমিহীন পরিবারগুলোর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব, বর্গাদের ভূমিকা ইত্যাদি অনেকগুলো দিকই তাঁর আলোচনাতে উঠে এসেছে।

বক্তব্যকে উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যার জন্য তিনি ভারত ইতিহাসের বেশ কিছু উদাহরণও তুলে ধরেন—যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ব্যবস্থার কথা; বেঙ্গল টেনান্সী এ্যাক্ট, ১৯২৮ সালের স্বরাজ্য পার্টির পেশ করা প্রজাস্বত্ত আইন, ১৯৫০ সালের বর্গাদার সংক্রান্ত আইন প্রভৃতির কথাও।

এছাড়া তিনি আলাদা করে উল্লেখ করেছেন কৃষি শ্রমিকদের কথা, তাদের মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায়ের কথা। তাঁর মতে '৫০-'৬০-এর দশকের তুলনায় কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে আজও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনগুলোকে এখনও প্রধান প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তবে যে বিষয়টির প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন তা হল ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা মাঝপথে রুদ্ধ হয়ে গেল কেন? এ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল ১৯৭৩ সালের টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট। এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সামন্তবাদের গাঁটছড়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এসেছে সবুজ বিপ্লব ও তার প্রভাবের কথা, কৃষিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রসঙ্গ। তাঁর মতে বর্তমানে মধ্য কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিতে নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও তার ফলাফলের কথা উল্লিখিত হল। কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশের কথা মেনে নিলেও তিনি স্বীকার করেন যে অঞ্চল ভেদে, রাজ্য ভেদে তারতম্য রয়েছে। রয়েছে মহাজনী ঋণ-এর অস্তিত্ব। ফলত ঘটে চলেছে ক্রমাগত কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা। ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে জল-জমি-জঙ্গলের ওপর কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ। ভূমিসংস্কার-এর শ্লোগান আজ শাসক শ্রেণীর কাছে ব্রাত্য। এর বদলে তুলে ধরা হচ্ছে এন আর ই জি এ-র কর্মসূচী। সেটাই বেশী বেশী করে প্রাধান্য পাচ্ছে।

- অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

... ওরা যাঁকে ভয় পেয়েছিল

একের পাতার পর

সরোজ দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন দেশব্রতী পত্রিকা প্রকাশনা ব্যবস্থায় তাঁর অন্যতম সাথী নিমাই ঘোষ।

ও সন্ত্রাস। এই প্রতিকুল পরিবেশেও আমাদের আমৃত্যু লড়াই চালিয়ে যেতে হবে '৭০ দশকে চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত সহ সমস্ত গণহত্যার তদন্তের দাবিতে। সি পি আই (এম এল) নেত্রী মীনা পাল বলেন, সরোজ দত্ত আমাদের শিখিয়েছেন কিভাবে বুনিয়াদী মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লড়াই আন্দোলনের পাঠ নেওয়া যায়। কার্তিক পাল বলেন, সামাজিক স্তরে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে '৭০-এর ঘাতকদের বিচার হবে না। মানুষের লড়াই ও সৃজনে বেঁচে থাকবেন সরোজ দত্ত। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন চন্দন সেন। দক্ষিণপন্থা ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন তিনি। তিনি বলেন এমারজেন্সীর সময় সে সুযোগ ছিল কিন্তু সে সময় ''জঙ্গীপনার মুখে মতাদর্শগত লড়াই হারিয়ে গিয়েছিল।'' বর্তমান জমানায় খালেদ চৌধুরী, নবারুণ ভট্টাচার্যের বুকের স্বপ্ন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

সঞ্চালক অমিত দাশগুপ্ত সদ্যপ্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেন। সভাস্থলে প্রয়াত নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতার লাইন ''এই জল্লাদের উল্লাস মঞ্চ আমাদের দেশ না'' স্মরণসভাকে বিশেষ অর্থবহ করে তুলেছিল। শহীদ সুব্বারাও পানিগ্রাহীর কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের আত্মঘোষণার গান ও ''ইন্টারন্যাশনাল'' গানের মধ্য দিয়ে স্মরণ কর্মসূচী শেষ হয়। যে পথ তিনি চিনিয়েছেন সেই পথের শেষ দেখার অঙ্গীকার নিয়ে সভাস্থল ছেড়ে যেতে বলতে থাকে সরোজ দত্তের আবক্ষ মূর্তি।

- শান্তনু ভট্টাচার্য

সাহিত্যের সার্কাসের আউটসাইডার ...

একের পাতার পর

তৎকর্তৃক রাশিয়ার বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য স্ট্যালিনকে তিনি দায়ীও করতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন তাঁকে নিদারুণ ব্যথিত করেছে। ঠাকুরপুকুর হাসপাতালে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি স্ট্যালিনের নির্মম আচরণের কারণ খুঁজেছেন। চলৎশক্তিহীন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে বলেছেন তিনি ঐ আচরণের কী ব্যাখ্যা পেয়েছেন। তিনি এও মনে করেছেন ঐ নির্মম আচরণের জন্যই ''সোভিয়েত ইউনিয়ন হ্যাড টু পে''।

নবারুণদা চলে যাওয়াতে পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ হারাল তাঁদের সভাপতিকে, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন হারাল তাঁদের একজন পৃষ্ঠপোষককে, তাঁর পরিবার থেকে চলে গেল সবথেকে পরিবার সম্পর্কে সচেতন অভিভাবককে, আর আমাদের মত মানুষেরা বঞ্চিত হলাম তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে, ভাষাবন্ধনের সাথীদের উপরে অপরিসীম দায়িত্ব বর্তাল পত্রিকাকে সঠিক পথে চালিয়ে যাওয়ার আর পাঠককুলের হাতছাড়া হল নবারুণদার অননুকরণযোগ্য তীক্ষ্ণ লিখন।

- অমিত দাশগুপ্ত

লেখার নন্দন ...

পাঁচের পাতার পর

সবচেয়ে আশা জাগিয়েছিল সেই শতক শেষ হচ্ছে অবসাদে বিষাদে যন্ত্রণাজর্জর অবস্থায়। আমি দৈনন্দিনতায়, প্রত্যহ নিকটে ও দূরে, নিয়ত যা দেখতে পাই তা হল পরতে পরতে স্তরে স্তরে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ, নতুনতর ঔপনিবেশিকতা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের অমানুষীকরণের দেখা না দেখা হাতকড়া ও চোখ ভুলানো ঠুলির ভার। সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিবাদের বালক বয়সের প্রত্যক্ষ নিষ্ঠুরতার চেয়েও এ যেন অধিকতর মারাত্মক, জঘন্য ও অপমানজনক। এই দলিত মথিত মানুষ ও তাদের জীবনের এক বিচিত্র ক্যালেইডোস্কোপের মধ্যে আমার জীবন কাটছে। চারপাশে তাই আমি দেখি। কিন্তু চূড়ান্ত নিরীখে এই বাস্তবকে আমি চিরস্থায়ী বলে মানি না। বাস্তবকে পাল্টাতে হবে। হবেই। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় চেতনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের অবশ্যই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।'' এই ভূমিকা পালন করে আমাদের সামনে উড়ে যাচ্ছে একের পর এক পাতা। কোনটা উড়ে এসেছে হারবার্ট, ভোগী, যুদ্ধ পরিস্থিতি, খেলনা নগর, কাঙাল মালসাট, লুব্ধক অটো বা মসোলিয়মের মতো উপন্যাস থেকে কোনটা বা হালাল ঝাণ্ডা, অন্ধ বেড়াল, ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাক বা কুম্ভীপাক-এর মত গল্পের বইগুলো থেকে। পুলিশ করে মানুষ শিকার, মুখে মেঘের রুমাল বাঁধা, রাতের সার্কাস-এর মত কবিতার বইগুলোতে যিনি বলতে চেয়েছেন বারবার ''এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়''—সেই কবি নবারুণ ভট্টাচার্যই কি এখন আমাদের সামনে শেষ শয্যায় শায়িত পিস হেভেনের মেঝেতে?

- সৌভিক ঘোষাল

২৮ জুলাই-৫ আগস্ট স্মরণ

২৮ জুলাই কমরেড চারু মজুমদারের শহীদ দিবসে দক্ষিণ কলকাতায় সি পি আই (এম এল) লিবারেশানের টালিগঞ্জ পার্টি কমিটির পক্ষ থেকে মেট্রো রেলের সূর্য সেন স্টেশনের সামনে, বাঁশদ্রোণী বাজারের কাছে ও বাঘা যতীন মোড়ে শহীদ স্মরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। উজ্জ্বল সরকার, তাপস মাসতি সহ লোকাল কমিটির সদস্যরা মাল্যদান করেন। তারপরে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে চারু মজুমদার, সরোজ দত্ত সহ ভারতীয় বিপ্লবের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

(পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত ২৮ জুলাই পালন রিপোর্টে উপরোক্ত অংশটি অপ্রকাশিত থেকে যাওয়ার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত—সম্পাদক।)

৫ আগস্ট কলকাতার বেহালা অঞ্চলের কালীতলা, সিরিটি ও মুচিপাড়া এলাকায়, ভবানীপুর ও কালীঘাট অঞ্চলে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

স্মরণসভা

সি পি আই (এম এল)-এর চুঁচুড়া লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে গত ২৬ জুলাই দলীয় কার্যালয়ে শঙ্কর ব্যানার্জীর তৃতীয় মৃত্যুদিবস পালন করা হয়। স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার, জেলা কমিটি সদস্য বটকৃষ্ণ দাস, শঙ্কর ব্যানার্জীর একমাত্র পুত্র রাজদীপ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাপস ঘোষ ও পার্টি সদস্যরা। সকলেই শঙ্কর ব্যানার্জীর নামাঙ্কিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এক মিনিট নীরবতা পালনের পর কল্যাণ সেন সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণা করেন এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করে ভিয়েত।

আমাদের শিশুরা সব কোথায় গেল!

এ পৃথিবী আজও শিশুদের বাসযোগ্য হয়ে উঠল না। বাসযোগ্য করে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার আজ বুঝি কেউ করে না। বিশ্ব জুড়েই চলছে নিধন যজ্ঞ। যুদ্ধ, ধ্বংস, দুর্ঘটনা, ব্যাধি, অপুষ্টি, অনাহার—কেড়ে নিচ্ছে অগুনতি শিশুর প্রাণ। এ পৃথিবী পারছে না তাদের রক্ষা করতে। কিছুদিন ধরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একের পর এক মর্মন্তুদ ছবি আমাদের চেতনার, অস্তিত্বের সমস্ত গ্রন্থিকেই নাড়িয়ে দেয়। একটা ছবিতে দেখা গেল ইজরায়েলের বোমার আঘাতে গাজায় নিহত এক ফুটফুটে ফুলের মত প্রস্ফুটিত শিশুর মৃতদেহটি নিয়ে তার পিতা এক কবরস্থানে কবর দেওয়ার জায়গা খুঁজছে। বাঁচিয়ে রাখা তো দূরে থাক, কবরস্থ করার জায়গারও এত অভাব আমাদের কৃপণ পৃথিবীতে! আরেকদিন দেখা গেল, বোমায় নিহত কন্যা সন্তানের সামনে মায়ের অঝোর কান্না।

গাজায় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটে চলেছে। সেখানে এমনকি রেহাই পায়নি রাষ্ট্রপুঞ্জের স্কুলগুলো। ত্রাণশিবির। এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য একদিকে আমেরিকা আর্জি জানিয়েছে ইজরায়েলকে। আবার নতুন করে সার সার অস্ত্র পাঠিয়েছে ইজরায়েলকে এই যুক্তিতে যে, 'ইজরায়েলের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার দায়বদ্ধতা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।' ধিক এই দ্বিচারিতা!

পুনের মলিন গ্রামে টানা বৃষ্টিতে কিছুদিন আগে আচমকা ধস নেমে আস্ত একটা গ্রামই বিলীন হয়ে গেল। বি পি এল-এর নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য পাহাড়ের কোলে ঐ জায়গাটা নাকি সরকার দিয়েছিল। গণচিতায় মহিলাদের কোল ঘেঁষে চিরনিদ্রায় শায়িত সার সার শিশু। মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে ১২০ কিমি দূরে, ভারতের পশ্চিম উপকূলের সহ্যাদ্রি পর্বতমালার কোলে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল দারিদ্রসীমার নীচে থাকা ঐ মানুষগুলোকে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেয়নি সরকার। অবিরাম গাছপালা কেটে ফেলায় তুমুল বৃষ্টির দাপটে নরম হয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের গা। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিল নির্মমভাবে। উজাড় হয়ে গেল পুরো একটা গ্রাম।

রেল বাজেট পেশ করার কিছুদিনের ব্যবধানে আবার ঘটে গেল হাড়-হিম করা বিরাট এক মানব ট্রাজেডি। অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানার মেডক জেলার মাসাইপেট গ্রামে। তারিখটা হল ২৪ জুলাই। সবে স্কুলে যাওয়ার জন্য মায়েরা সন্তানদের প্রস্তুত করে, গুছিয়ে-গাছিয়ে তুলে দিয়েছিলেন স্কুল বাসে। আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাদে সেই মায়েদের কাছেই ফিরে এল তাদের সন্তানদের প্রাণহীন নিথর দেহ। একজন মা তার মৃত দুই পুত্র সন্তানের দেহ আঁকড়ে অঝোর ধারায় কাঁদছেন, সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই ছবি যেন নিরুচ্চারে অনেক কথা বলে গেল। তুলে দিল হাজারো প্রশ্ন। ঠিক কিছুদিন আগে, নরেন্দ্র মোদির সরকার পেশ করল তার প্রথম রেল বাজেট। রেলমন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া লোকসভায় রেলকে আরও গতিশীল করতে গদগদ স্বরে বুলেট ট্রেনের গল্প শোনালেন। **মোদির আমেদাবাদ থেকে দিল্লী—এই রুটে বুলেট ট্রেন নির্মাণ করতে বাজেট ধার্য করল ৬০,০০০ কোটি টাকা। কিন্তু ৩৫,০০০ রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে লোক নিয়োগ করার জন্য নাকি ভাঁড়ারে টাকা নেই।** তেলেঙ্গানার ঐ বাস দুর্ঘটনায় নিহত শিশুরা রক্ষীবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে ট্রেনের ধাক্কার শিকার। গ্রামবাসীরা বারবার ঐ লেভেল ক্রসিংয়ে লোক নিয়োগ করার দাবি জানালেও কোন সরকারই তা কানে নেয়নি। এই দুর্ঘটনার শিকার ৫ থেকে ১৫ বছরের শিশু-কিশোর। এদের মধ্যে আবার বেশ কয়েকজন নার্সারির পড়ুয়া।

পশ্চিমবাংলার ক্যানভাসে প্রতিদিন ভেসে উঠছে শিশুমৃত্যুর শিউরে ওঠা ঘটনাক্রম। ৩১ জুলাই ও ১ আগস্ট ----এই দুদিনেই জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে প্রাণ হারালো ১২ জন সদ্যোজাত শিশু। আর এদের ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে ১৫ ঘন্টার মধ্যে। মৃত ১২টি শিশুর ৮ জনই জন্মেছিল ঐ হাসপাতালে। মৃত্যুর কারণ প্রবল শ্বাসকষ্ট। বহুদূর থেকে একেবারে শেষ অবস্থায় শিশুদের আনার যে গল্প শোনানো হয়—এক্ষেত্রে তা খাটে না। শিশুমৃত্যুর ঘটনা সরকারি হাসপাতালে পরিকাঠামোর ভেঙ্গে পড়ার করুণ ছবিকে ফের মেলে ধরল। সংবাদে প্রকাশ, চুক্তিতে নিযুক্ত চিকিৎসক ও সদ্য পাশ করা চিকিৎসকদের নিয়েই হাসপাতালের নবজাতক ইউনিট চলত। কেউই শিশু বিশেষজ্ঞ নন। সরকারি এস এন সি ইউ ট্রেনিং নিয়ে হাসপাতাল চালাচ্ছে।

এ রাজ্যে ধারাবাহিক শিশুমৃত্যুর দিকে এবার চোখ ফেরানো যাক। ২০১২ সালে, এক মাসের মাথায় মালদার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ১১০ জন শিশুর মৃত্যু হয়। প্রবল সমালোচনার মুখে সেদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক নজীরবিহীন অসংবেদী মন্তব্য করেন। **তাঁর প্রতিক্রিয়া—তিনি ক্ষমতায় আসার আগেই ঐ সমস্ত শিশুরা গর্ভজাত হয়েছিল। তাই দায় বর্তায় পূর্বতন বাম সরকারের, তাঁর নয়।** ২০১২ সালে অক্টোবর ও নভেম্বরের গোড়ায়, এক সপ্তাহের মধ্যে ৪৫টি শিশুর মৃত্যু হয়। মমতা তখন পুরোপুরি নিশ্চুপ ছিলেন। ঐ একই বছরে, কলকাতার বি সি রায় হাসপাতালে ৩৮ ঘন্টার মধ্যে মারা যায় ১১ জন সদ্যোজাত। ঠিক তার আগের বছরে, একই হাসপাতালে মাত্র ৫ দিনের ব্যবধানে মারা গিয়েছিল ৩৫টি শিশু। ২০১৩ সালের জুন মাসে পুরুলিয়ার সরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যায় ১১ জন শিশু। ফের, সেপ্টেম্বর ২৫-২৬, ২০১৩ সালে, কলকাতার বি সি রায় হাসপাতালে ১৫ শিশুর মৃত্যু ঘটল। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে, মাত্র ৭২ ঘন্টার মধ্যে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মারা গেল ২০ জন সদ্যোজাত। মালনার এই হাসপাতাল যেন হয়ে উঠেছে শিশুদের মৃত্যু উপত্যকা। তাই ফের ২০১৪ সালে জানুয়ারি মাসের গোড়ায় একই হাসপাতালে ১৬ দিনের মধ্যে প্রাণ গেল ১৬টি শিশুর। ২০১৪-র জুলাই মাসে ওখানেই আবার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে চিরতরে চোখ বুঁজল ১০টি শিশু। তালিকা ক্রমে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে।

প্রথম দিনে শিশুমৃত্যুর হারে শীর্ষে ভারত

জন্মের প্রথম দিনেই শিশুমৃত্যুর হারে অন্যান্য সকল দেশকে পেছনে ফেলে ভারতবর্ষ উঠে এসেছে পয়লা নম্বরে। মার্কিন সংস্থা 'সেভ দ্য চিলড্রেন' প্রকাশিত রিপোর্ট 'স্টেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মাদার্স ২০১৩' থেকে উঠে এসেছে এই তথ্য।

ঐ তথ্য অনুযায়ী, **প্রতি বছর ৩ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় শিশু জন্মের এক দিনের মধ্যেই মারা যায়,** যা বিশ্বের মোট শিশুমৃত্যুর **প্রায় ২৯ শতাংশ।** নির্দিষ্ট সময়ের আগে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশুর জন্ম এবং মায়ের দুর্বল স্বাস্থ্যের কারণেই বাড়ে শিশুমৃত্যুর হার। মায়ের ও শিশুর সুস্থতার বিচারে ভারতের স্থান ১৪২তম।

(সূত্র ঃ এই সময়, ৮ মে, ২০১৩)

ব্রিটিশ সংস্থা ডি এফ আই ডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) ৫ বছর ধরে সুন্দরবনের ১৯টি প্রশাসনিক ব্লকে শিশুস্বাস্থ্য নিয়ে এক সমীক্ষা চালায়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতি ৩ জন শিশুর মধ্যে ১ জনের রয়েছে ফুসফুসে সংক্রমণ।

প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম। ৫ বছরের কমবয়সীদের প্রায় ৬৫ শতাংশ গভীর অপুষ্টির শিকার। আয়লার পরবর্তীকালে সেখানকার পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। ঐ সমীক্ষায় আরও প্রকাশ, গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার যেখানে ৭৯ শতাংশের কাছাকাছি, সুন্দরবনে তা সাকুল্যে মাত্র ২৯ শতাংশ। বাকিরা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেন না। তাঁদের ভরসা দাই ও হাতুড়ে।

অধিকাংশ মায়েরা এমন গভীর অপুষ্টির শিকার যে বুকের দুধের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। নবজাত শিশুকে ভাতের ফ্যান খাওয়ানো হচ্ছে এমন ভুরি ভুরি নমুনা সমীক্ষকেরা দেখেছেন। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ও কুলতলি ---- এই ব্লকগুলোতে সমস্যা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পশ্চিমবাংলায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থা ইউনিসেফ সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে মহিলা জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মাত্র ১৯ বছর বয়সেই অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। ৬০ শতাংশের বেশি গর্ভবতী মায়েরা গভীর রক্তাল্পতার শিকার। অপুষ্টি হল তার মূল কারণ।

উত্তরবঙ্গে, বিশেষত ডুয়ার্সে বন্ধ চা বাগিচায় মৃত্যুমিছিল অব্যাহত। অনাহার, অপুষ্টি, নানা রোগভোগে প্রাপ্তবয়স্ক চা বাগিচার শ্রমিক ও শিশুরা মারা যাচ্ছে। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এনসেফেলাইটিসের মরণ কামড়। উত্তরবঙ্গ সফরে রেকর্ড স্থাপন করা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ''উন্নয়ন''-এর ক্যানেস্তারা বাজিয়ে রাজ্যবাসীর কান ঝালাপালা করে তুলছেন। কিন্তু তাঁর পদস্পর্শে বিন্দুমাত্র বদল ঘটল না মৃত্যুমিছিলের ধূসর চিত্রকল্পটির। মালদা সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নতি বা বন্ধ চা বাগিচার হতদরিদ্র মানুষদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বহু বিজ্ঞাপিত উন্নয়নের গালগপ্পো নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ঠিক এমনই এক সময়ে, কয়েকদিন আগে প্রকাশিত সি এ জি-র রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে তীব্র সমালোচনা করেছে আই সি ডি এস প্রকল্পটির রূপায়ণ ক্ষেত্রে।

ঐ রিপোর্টে সি এ জি বা ক্যাগ স্পষ্টভাবেই বলেছে যে কেবলমাত্র বন্ধ চা বাগানের ক্ষেত্রেই নয়, রাজ্য জুড়েই উক্ত প্রকল্পের কাজটি মুখ থুবড়ে পড়েছে। গর্ভবতী মায়েদের অপুষ্টি রোধে এবং কম ওজনের সদ্যোজাত শিশুর হার ঠেকাতে রাজ্য সরকার গুরুতরভাবে ব্যর্থ। রাজ্যে চলতে থাকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে রিপোর্ট তুলে ধরেছে এক হতাশজনক ছবি। দেখা যাচ্ছে, রাজ্যে মাত্র ২৫ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের রয়েছে নিজস্ব বিল্ডিং, ১৪ শতাংশকে কাজ করতে হচ্ছে খোলা আকাশের নীচে। পানীয় জল ও শৌচাগার রয়েছে যথাক্রমে ৫৭ ও ৩২ শতাংশ ক্ষেত্রে।

যে ২০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই সমীক্ষা চলে, সেখানে মাত্র ২৯টি (২৫ শতাংশ) কেন্দ্র নির্ধারিত ৩০০ দিনের পরিপূরক পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। বি পি এল-এর দামে কেন্দ্রীয় সরবরাহের চাল এবং তা সংগ্রহ না করার ব্যর্থতার জন্য অতিরিক্ত ২৪০.৬৬ কোটি টাকা দিতে হয়েছে রাজ্যের কোষাগার থেকে।

কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ইতিমধ্যেই যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়ণ করার ছাড়পত্র এসেছে তা চালুই করা হয়নি। নতুন নতুন প্রকল্প রূপায়িত করতে প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে তা শুরু করা গেল না। যক্ষা রোগের প্রতিষেধক ছাড়া অন্যান্য রোগের টিকাকরণ কর্মসূচী না নেওয়ায় নানা রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। ৫৩-৬৯ শতাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর অভাবে অর্ধেকেরও বেশি কেন্দ্র ঠিকমত দেখভাল করা যাচ্ছে না (সূত্র ঃ হিন্দু, ১ আগস্ট, ২০১৪)। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দফতর থেকে বেশ কয়েকবার সমীক্ষা চালানো হয় গ্রামীণ দারিদ্র নিরূপণের লক্ষ্যে। সাকসেনা কমিটির তরফ থেকে ঐ সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে দেশে পঞ্চাশ শতাংশ গ্রামীণ শিশু কম ওজনের ও ৭৫ শতাংশ মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে। আরও কয়েকটি সংস্থা যে সমীক্ষা চালায় তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ডের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বেশ খারাপ!

কিন্তু তাতে রাজ্য সরকারের কী যায়-আসে! **সরকারের দু-বছরের সাফল্য নিয়ে গত বছরই মমতার সরকার খরচ করে বসল ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আর মোট খরচের ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকা চলে গেল মুখ্যমন্ত্রীর কাট-আউট, ফ্লেক্স প্রভৃতি লাগাতে।** একদিকে মৃত্যু-অন্ধকার-হাহাকার, অপরদিকে চলছে ফূর্তি-পুরস্কার বিতরণি-মেরুদণ্ডহীন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের কিনে নিতে লক্ষ কোটি টাকার 'বিনিয়োগ'! এদিকে, তিলে তিলে, নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে ফুলের কুঁড়িরা। ধূসর থেকে ধূসরতর দিগন্তে ক্রমে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের অনাবিল শিশুরা।

- অতনু চক্রবর্তী

উত্তর ২৪ পরগণায় চটকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর যুক্ত কনভেনশন

উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরের রবীন্দ্র ভবনে গত ১ জুলাই চটকল শ্রমিকদের ২০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত কনভেনশন হয়ে গেল। শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল ঠাসা। শতাব্দী প্রাচীন পরিবেশ বান্ধব এই শিল্পটি লাগাতার গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। চটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ৪০ লক্ষ পাট চাষি ও ২ লক্ষ ৫০ হাজার চট শ্রমিকের জীবন-জীবিকা আজ বিপন্ন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-স্বার্থ বিরোধী নীতি, উদাসীনতা এবং চটকল মালিকদের মুনাফাখোর পলিসি এই সংকটের জন্য মূলত দায়ি। নতুন করে পুঁজি বিনিয়োগ ও আধুনিকীকরণ না করা, শ্রম আইন না মানা এবং খাদ্যশস্য ও চিনিতে ১৯৮৭-র আইন অনুসারে চটের ব্যাগের ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক রাখার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার পলিসি শিথিল করার কারণে আজকের এই অভূতপূর্ব সংকটের পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। চটের ব্যাগের বড় ক্রেতা রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবছর তাদের অর্ডার কমিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৭-র প্যাকেজিং আইনকে শিথিল করার অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যদিও বলছে, কিন্তু এরাজ্যে উৎপন্ন চাল ও আলুকে চটের ব্যাগে প্যাকেজিং-এর আওতায় আনছে না। এখানে প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ বেল ব্যাগের প্রয়োজন। মমতা সরকার চালকল মালিক এবং হিমঘর মালিকদের চটের ব্যাগ কেনার নির্দেশ দিতে পারত, কিন্তু এখনও কোনো সদর্থক উদ্যোগ নেয়নি। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে পাট চাষের প্রচুর খরচ বেড়েছে, পাটের ন্যায্য মূল্য চাষিরা পাচ্ছে না, কম দামে পাট বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। মিল মালিক যখন তখন মিল বন্ধ করে দিচ্ছে বা শিফট্ কমিয়ে কাজের ঘন্টা-দিন কমিয়ে দিচ্ছে। শ্রমিকরা পি এফ, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে বি সি এম এফ সহ ২০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন রাজ্য সরকারের কাছে দাবিপত্র পেশ করেছে। উপরোক্ত যুক্ত কনভেনশন দাবি তুলেছে, অবিলম্বে চটকল শ্রমিকদের দাবি সনদের মীমাংসা করতে হবে, জুট প্যাকেজিং আইনকে শিথিল করা চলবে না। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন মাজাহার খান (এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত বি সি এম এফ), দীপক দাশগুপ্ত (সিটু), কুমারেশ কুন্ডু (এ আই টি ইউ সি), অমল সেন (ইউ টি ইউ সি) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন এ আই সি সি টি ইউ জেলা সভাপতি নারায়ণ দে।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক হোন

এনসেফ্যালাইটিস ছড়াচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতিরোধে সরকারি তৎপরতা তেমন কোথায়!

ধীরে ধীরে জাপানিজ্ এনসেফ্যালাইটিস (জে ই) উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অতিক্রম করে দক্ষিণবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। মোটামুটিভাবে বেশ কিছু মানুষের যখন মৃত্যু হয়ে গেছে (সঠিক সংখ্যাটা নিয়ে যেন মজার খেলা চলছে) তখন স্বাস্থ্য অধিকর্তারা ঘুম থেকে উঠে হাই তুলতে লাগলেন, ''সবুর করুন, সব ব্যবস্থা হচ্ছে''। ওদের কথা শুনে মনে হবে জে ই রোগটা যেন হঠাৎ নতুন আবিষ্কৃত হল। কোন সুদর বিদেশ থেকে হঠাৎ আমাদের দেশে উঠে চলে এল। মনে হবে, জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে এইসব অধিকর্তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, প্রিভেনটিভ এবং সোশ্যাল মেডিসিন-এর বাইবেল পার্ক-এর বই এদের পড়াই নেই। হু-র রিপোর্ট এদের কাছে বোধহয় পৌঁছয় না।

যদিও ২৫ বছর আগে জে ই রোগটি পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ চীন, জাপান, কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ ছিল, সম্প্রতি এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অর্থাৎ থাইল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এবং ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিবছর এই অঞ্চলে ৫০,০০০ মানুষ আক্রান্ত হন যার মধ্যে ১০,০০০ মানুষ মারা যান ও ১৫,০০০ অক্ষম হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষে ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই রোগ ধরা পড়েছে। তবে বিশেষত, অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, বিহার, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, মণিপুর, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এর বিশেষ প্রকোপ হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ এই রোগের ঝুঁকির মধ্যে বাস করছে।

আমাদের স্বাস্থ্য অধিকর্তারা কিন্তু এই বিপদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। এই ধরণের মশা বাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য যেটি প্রথম দরকার সেটা হল 'সারভেলেন্স' অর্থাৎ লাগাতার নজরদারী। এই রোগের বাহক কুলিসাইন মশা কোথায় বংশ বিস্তার করছে, তাদের চরিত্রে কি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইত্যাদি জানার জন্য পতঙ্গবিদ দরকার। উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরে একজনও পতঙ্গবিদ নেই। জে ই রোগের ধারক হল শুয়োর এবং জলাশয়ের পাখী (যেমন বক, সারস, হাঁস)। শুয়োরের খোঁয়াড়গুলোয় নজরদারী রাখার কোন বন্দোবস্ত নেই। শুয়োরদের ভ্যাক্সিন দেওয়া তো দূরের কথা। বাহক মশাগুলো সাধারণত ধানক্ষেত, গ্রামের চারপাশে ঝোপঝাড়ে বংশবৃদ্ধি করে। সেখানে মশা নিধনকারী ধোঁয়া ছড়ানোর কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ আগে থেকে সতর্ক হওয়ার কোনও চেষ্টাই নেই, যদিও বিপদটা জানাই আছে। এই রোগে ১৫ বছরের নীচের শিশুরা বেশী আক্রান্ত হন, প্রায় ৮৫ শতাংশ। সে জন্য এই বয়সের ছেলেমেয়েদের ভ্যাক্সিন দেওয়া খুব জরুরী। কিন্তু ভ্যাক্সিনেশনের হার সন্তোষজনক নয় যদিও এটি জাতীয় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ১১টি জেলার ক্ষেত্রে। অবশ্য এ বছরে দেখা যাচ্ছে বড়রাও ভাল সংখ্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। এটা অন্য কোন ভাইরাল বা ভাইরাসের গুণপরিবর্তন তা গবেষণা করা দরকার, যার জন্য চাই অভিজ্ঞ ভাইরোলজিস্ট। আমাদের রাজ্যে অভিজ্ঞ ভাইরোলজিস্ট আছেন কিন্তু সরকার তাঁদের পরামর্শ নিলে তবে তো!

আসলে আমাদের দেশে তথা রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা চলে এ্যাড হক্ ভিত্তিতে। কোন পূর্বপরিকল্পিত প্ল্যান নেই। আগাম বিপদ সচেতনতা ও তার সতর্কতা নেই। যখন কোন কিছু নিয়ে কাগজে হইচই হয় তখন এ্যাড হক্ কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শিশু মৃত্যু নিয়ে হইচই হল, কয়েকটা এস এল সি ইউ তৈরী হয়ে গেল। সেগুলোর ভবিষ্যৎ কেউ যানে না। জে ই নিয়ে হইচই শুরু হল। শুয়োর ধরে, খোঁয়াড়ে মশারী টাঙিয়ে সিসিটিভি লাগিয়ে দেওয়া হল। রক্তে জে ই সনাক্ত করার জন্য কিট্ পাঠিয়ে দেওয়া হল যার বাস্তব ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও সচেতনতা নেই। এ এমন একটা কিট্ যা একসঙ্গে ৯০/৯৫ জনকে পরীক্ষা করা না হলে খরচায় পোষায় না। এরকম কিছু চট্জলদি পদক্ষেপ নিয়ে জনমতকে শান্ত করার চেষ্টা, অন্যদিকে তথ্য ধামাচাপা দিয়ে বিপদের ঝুঁকিটা কম করে দেখানো—এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ সরকারি উদ্যোগ!

মন্ত্রীদের না জানাই স্বাভাবিক। ডাক্তার-আমলা যা বলবেন মন্ত্রীরা তারই প্রতিধ্বনি করবেন। এই সমস্ত ডাক্তার-আমলাদের অনুরোধ করব, দয়া করে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজান। হয়তো সময় লাগবে, কিন্তু অনেকগুলো প্রাণ বাঁচার মতো পরিস্থিতি তৈরী হবে। সরকার বড় বড় ঝাঁ চকচকে চোখ ধাঁধানো বাড়ী না বানিয়ে একেবারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে নজর দিক। রোগ ছড়ানোর আগে তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলুক।

- ডাঃ দেবাশীষ দত্ত

সি পি আই (এম এল) ১৯তম পাণ্ডুয়া ব্লক সম্মেলনের প্রচার-প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে

হুগলী জেলায় সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হল পাণ্ডুয়া ব্লক। লোকসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় পাণ্ডুয়ার কিছু কিছু লোকাল ও ব্রাঞ্চ স্তরের বার্ষিক সম্মেলন বা সাধারণ সভা যেমন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি তেমনি ব্লক সম্মেলনও সম্পন্ন করা যায়নি। নির্বাচন মিটে যাওয়ার পর এই বকেয়া সাংগঠনিক কাজ সমাধা করার জন্য পাণ্ডুয়া ব্লক পার্টি সংগঠন নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ব্লক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে বড় আকারে রাজনৈতিক প্রচার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্বে, ২৮ জুলাই চারু মজুমদারের শহীদ দিবসকে সামনে রেখে '২৭ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট'—এক সপ্তাহব্যাপী প্রচার কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম রাজ্য-রাজনীতিকে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে মেরুকৃত করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের এই অপপ্রচারে সাধারণ জনগণের সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থী কর্মী বাহিনীও আংশিকভাবে ম্রিয়মান ও উদ্যোগহীন হয়ে পড়ছেন। সে কারণেই তৃণমূল-বিজেপির দক্ষিণপন্থী জনবিরোধী রাজনীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের কাজে আমাদের পাল্টা প্রচারকে জনপ্রিয়ভাবে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে পার্টি সংগঠনকে সচল ও গতিশীল রাখাটা অনেকাংশই সম্ভব হচ্ছে।

দুটি গ্রামীণ হাট ও একটি গঞ্জের বাজারে পথসভার পর তিনটি গ্রাম জুড়ে সাইকেল মিছিল—কি আমাদের নিজস্ব কর্মীবাহিনী, কি ব্যাপক বামপন্থী ও সংগ্রামী জনগণ—সবার মধ্যেই উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। দ্বারবাসিনীর হাটে প্রচার হয়েছে ২৭ জুলাই; দে পাড়ার হাটে (ইলছোবা এলাকা) সভা হয়েছে ৩১ জুলাই এবং বৈঁচী জি টি রোড-গুড়াপ রোডের ক্রশিংয়ে সভা হয়েছে ১ আগস্ট। প্রচার সভাগুলোতে ব্লক পার্টির বিভিন্ন নেতাদের সাথে সাথে কৃষিমজুর পরিবার থেকে উঠে আসা কর্মীরাও বক্তব্য রেখেছেন। এদের মধ্যে বিনয় দাস ও সাধন মালের নাম উল্লেখযোগ্য।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে 'মোদি ম্যাজিকের' আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। রোল বাজেট ও সাধারণ বাজেটে কিভাবে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের পৌষ মাস আর খেটে খাওয়া মানুষের সর্বনাশ হচ্ছে—তা তুলে ধরা হয়। রেশন ব্যবস্থা সহ গরিবদের জন্য চিহ্নিত প্রকল্পগুলো তুলে দেওয়া, গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প ৬০ শতাংশ কাটছাঁট করা ও সর্বোপরি সংগ্রামী জনগণের ঐক্যকে দুর্বল করার জন্য দেশকে আবার ধর্মের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করার চক্রান্তের কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়। প্রচার সভাগুলোতে তৃণমূলের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বলার সাথে সাথে গ্রাম বাংলায় সমবায়গুলোকে লাটে তুলে দেওয়া ও গ্রামীণ গরিবদের মহাজনী ঋণের কবলে ঠেলে দেওয়ার বিষয়েও বক্তব্য রাখা হয়। শেষমেষ মমতা ব্যানার্জী শিল্প ধরে আনতে যে হাস্যকরভাবে সিঙ্গাপুরে উড়ে যাচ্ছেন এবং রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের দায় এড়িয়ে ব্যবসা করার পরামর্শ দিচ্ছেন—তারও তীব্র নিন্দা করা হয়। প্রতিটি সভাতেই কেন্দ্র ও রাজ্য—এই দুই জল্লাদের বিরুদ্ধে মানুষকে একজোট হয়ে সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। প্রথম পর্বের প্রচারের শেষ দিন (৩ আগস্ট) পথসভার পরিবর্তে সাইকেল মিছিল সংগঠিত হয়। সাঁচিতারা, বেলুন ও দমদমা—এই তিনটি গ্রাম জুড়ে সাইকেল মিছিলে কৃষিমজুর কর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন ব্লক সম্পাদক শুভাশীষ চ্যাটার্জী ও 'আয়ালা' নেতা নিরঞ্জন বাগ।

প্রচারের দ্বিতীয় পর্ব নির্ধারিত হয়েছে ৯ আগস্ট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস পালনের জন্য। ঐ দিন পাণ্ডুয়া স্টেশন এলাকায় সারা ভারত কিসান মহাসভার ব্যানারে যে প্রচার চলবে সেখানে শাসকশ্রেণীর দ্বারা সৃষ্ট কৃষি সংকট ও তার মোকাবিলায় সংগ্রামী কৃষিনীতি ও বিকল্প পথ কি হতে পারে—তা জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। কৃষক আন্দোলনের চাপে ইউ পি এ-২ সরকার জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে কৃষকদের প্রতি আংশিক নমনীয়তা দেখিয়ে যে আইন (এল এ আর আর) তৈরী করেছিল বিজেপি সেখানে সংশোধনী এনে কৃষকদের সাথে আরও যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, জি এম বীজ বেপরোয়াভাবে চালু করতে চাইছে ও ন্রেগা প্রকল্প তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে—৯ আগস্ট প্রচারসভায় তার তীব্র প্রতিবাদ করা হবে।

সম্মেলন উপলক্ষে প্রচার-কর্মসূচীর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী বাড়ী অর্থ সংগ্রহের কাজও শুরু হয়েছে। স্থির হয়েছে সংগৃহীত অর্থের একাংশ রাজ্য পার্টি অফিসের সংস্কারের জন্য প্রদান করা হবে। আশা করা যায়, ১৭ আগস্ট জেলা কৃষিমজুর কর্মীসভাটিও পার্টির পাণ্ডুয়া ব্লক সম্মেলনের কাজে গতি আনতে সহায়ক হবে।

ব্লক সম্মেলনের জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্র ছাপার কাজও শেষ হওয়ার মুখে। এক কথায়, ২৪ আগস্ট পার্টির পাণ্ডুয়া ব্লক সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্ব ভাল মাত্রায় এগিয়ে চলেছে।

- মুকুল কুমার

স্মরণসভা

জলপাইগুড়ি জেলায় সি পি আই (এম এল) সদস্য কমরেড সত্য সরকার প্রয়াত হয়েছেন গত ৬ জুলাই। তিনি একজন লড়াকু সদস্য ছিলেন। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় ৩ আগস্ট বাসস্থান গোমস্তাপাড়ায় সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রে। শুরুতে পার্টি পতাকা উত্তোলন করেন প্রয়াত কমরেডের স্ত্রী শেফালী সরকার। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন শ্রীমতী সরকার সহ স্থানীয় অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ইভা রায় (আর এস পি), বিনয় চক্রবর্তী (আর এস পি), পরিতোষ দাস (সি পি আই এম এল রেড ফ্ল্যাগ) এবং সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জেলা ও শহর কমিটির নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত কমরেডের জীবনদর্পণের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের ভারপ্রাপ্ত জেলা সম্পাদক সুভাষ দত্ত সহ পার্টি নেতা মুকুল চক্রবর্তী, বিজন সরকার, প্রদীপ গোস্বামী ও পরিতোষ দাস এবং শেফালী সরকার। এছাড়া বাবার কথা বলেন, প্রয়াত কমরেডের কন্যা ও পুত্র। উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত কমরেডের দাদা। সভায় এলাকার মানুষদের বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। স্মরণসভা সঞ্চালনা করেন সুভাষ দত্ত।

কমরেড তৃপ্তি ত্রিবেদীর স্মরণসভা
স্থান—শিয়ালদহ ইস্ট লাইব্রেরী হল
(প্রাচী সিনেমার গলি)
১১ আগস্ট—বিকাল ৫.৩০ মিনিট
আয়োজনে—সি পি আই (এম এল) লিবারেশন
কলকাতা জেলা কমিটি

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com